ইকামাতে দ্বীন

অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রাথমিক কথা

১৯৭৮ সালে 'বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন' নামে প্রথম প্রকাশিত এবং ১৯৮১ সালের তৃতীয় সংস্করণ থেকে "ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন" নামে আমার লেখা পুস্তিকাটিতে চিন্তা-প্রবাহের যে সিরিজ প্রকাশিত হয় তারই দ্বিতীয় সিরিজ হিসেবে 'ইকামাতে দ্বীন' লিখছি। প্রথম সিরিজে দেখান হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাকের মেহেরবানীতে বাংলাদেশে ইসলামের খেদমত বিভিন্নভাবে যথেষ্ট হচ্ছে। মাদ্রাসা, মসজিদ, খানকাহ, ওয়ায, তাবলীগ, ইসলামী সাহিত্য ইত্যাদির মাধ্যমে দ্বীন-ইসলামের যে বিরাট খেদমত হচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রকার খেদমতই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ; সকলের খেদমত মিলেই ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি করছে এবং এ খেদমতগুলোকে পরস্পর পরিপূরক মনে করা প্রত্যেক মুখলিস খাদেমে দ্বীনের কর্তব্য।

যারা নিজেদের দ্বীনি খেদমতকেই শুধু মূল্যবান মনে করে এবং অন্যদের খেদমতের কদর করে না, তাদের দ্বারা উম্মাতের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবার আশংকা রয়েছে। সবারই এ ধারণা করা উচিত যে, আমরা সবাই বিভিন্ন আকারে ও পদ্ধতিতে একই মহান দ্বীনের খেদমত করছি। একথাও ইখলাসের সাথে সবারই মনে রাখা উচিত যে, উপরোক্ত সব ক'টি খেদমতই নিজ নিজ ক্ষেত্রে মূল্যবান ও যরুরী। যদি সবাই সবার খেদমতকে মূল্যবান বলে স্বীকার করে তাহলে দেশের ইসলামী শক্তিগুলোর মধ্যে ঐক্য ও মহব্বত সৃষ্টি হবে এবং দ্বীনের মর্যাদা আরও বাড়বে।

ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও মক্তবগুলো দ্বারা যে খেদমত হচ্ছে তা বড় বড় মাদ্রাসা দ্বারা সম্ভব নয়। আলীয়া ও কাওমী মাদ্রাসায় যে উলামা তৈরী হচ্ছে তা তাবলীগ জামায়াতের দ্বারা হওয়া অসম্ভব। আবার তাবলীগ দ্বারা অগণিত জনসাধারণ দ্বীনের যেটুকু আলো পাচ্ছে তা মাদ্রাসার মারফতে পাওয়া অবাস্তব। শিক্ষিত সমাজ ইসলামী সাহিত্য দ্বারা ইসলামের জ্ঞান অর্জন করছে। কিন্তু ওয়ায়েযদের দ্বারা অশিক্ষিত লোকেরাও ইসলামের জ্ঞান ও জযবা হাসিল করছে। মাদ্রাসা, ওয়ায ও তাবলীগ আছে বলেই

মসজিদগুলো আবাদ আছে। এসব দিক খেয়াল করলে সব রকম খেদমতকেই মূল্যবান মনে হবে।

'ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন' বইতে প্রধানত খেদমতে দ্বীন সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে এবং দ্বীনের খাদেমদের ঐক্যের উপরই বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। ইসলামী ঐক্যের রূপ কী হতে পারে সে বিষয়ে একটি বাস্তব প্রস্তাবও পেশ করা হয়েছে। কিন্তু ইকামাতে দ্বীন সম্পর্কে ঐ পুস্তিকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব সম্পর্কে শুধু কিছুটা ইংগিত সেখানে দেয়া হয়েছে। ইকামাতে দ্বীন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজনেই আর একটি বই লেখা দরকার হয়ে পড়েছে। তাই এ বইটি ঐ বই-এরই পরিপূরক এবং ঐ বইটি যারা পড়েছেন তাদের নিকট এ বইটির আবেদন বেশী স্পষ্ট হবে বলে আমার আশা।

'ইকামাতে দ্বীন' পুস্তকটিতে এমন একটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে যার চর্চা দ্বীনের খাদেমগণের মধ্যেও খুব কম। তাই বিষয়টিকে সহজভাবে পেশ করার প্রয়োজনে বিভিন্ন দ্বীনি খেদমতের উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে, খেদমতে দ্বীন ও ইকামাতে দ্বীনে পার্থক্য রয়েছে। আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি যাতে আমার কোন কথায় আল্লার দ্বীনের খাদেমগণের অসন্তুষ্ট হবার কারণ না ঘটে। যদি এমন কোন কথা তবু রয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমাকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করবো ইনশাআল্লাহ।

❐

এ বইয়ের আলোচ্য বিষয়

এ পুস্তকে ব্যবহৃত কুরআনী পরিভাষা

আধুনিক শিক্ষিত লোকদের নিকট যেসব পরিভাষার অর্থ জানা না থাকার ফলে বইটির বক্তব্য অস্পষ্ট থাকার আশংকা রয়েছে সে সবের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দেয়া হলো ঃ

১। **দ্বীন**—আনুগত্য-আল্লার আনুগত্যের উদ্দেশ্যে রাসূলের মাধ্যমে প্রেরিত জীবন বিধান।

২। **ইকামাত**—প্রতিষ্ঠা, কায়েম, স্থাপন।

৩। **ইকামাতে দ্বীন**—আল্লার প্রেরিত বিধানকে বাস্তবায়িত করা বা প্রতিষ্ঠিত করা।

৪। **হক**—সত্য, যুক্তিপূর্ণ, অখণ্ডনীয়।

৫। **দ্বীনে হক**—সত্য দ্বীন—অর্থাৎ ঐ দ্বীন যার সত্যতা অখণ্ডনীয় ও যুক্তিপূর্ণ।

৬। **বাতিল**—মিথ্যা, অসত্য, খণ্ডনীয়, অযৌক্তিক।

৭। **দ্বীনে বাতিল**—মিথ্যা দ্বীন বা আনুগত্যের অযৌক্তিক বিধান, অসত্য জীবন ব্যবস্থা।

৮। **খেদমত**—সেবা, সহায়তা, কাজ।

৯। **খেদমতে দ্বীন**—দ্বীন ইসলামের সেবা বা দ্বীনের উন্নতির জন্য কাজ।

১০। **খাদেমে দ্বীন**—ইসলামের সেবক ও সাহায্যকারী।

১১। **ইলম**—জ্ঞান, আল্লার পক্ষ থেকে নবীর নিকট প্রেরিত জ্ঞান যা কুরআন ও হাদীসে আছে।

১২। **উলামা**—জ্ঞানী, কুরআন ও হাদীসে যারা জ্ঞানী, এর একবচন হলো আলেম।

১৩। **ফিতনা**—বাধা, পরীক্ষা, সন্দেহে আটকে পড়া-আল্লার পথে চলতে গেলে যত বাধা, পরীক্ষা ও সন্দেহ দেখা দেয় সবই ফিতনা।

১৪। **ওহী**—ইংগিত, জানান, প্রকাশ করা, প্রেরণা দান ইত্যাদি। আল্লার নিকট থেকে মানুষের নিকট বাণী পাঠাবার উপায়।

১৫। হেদায়াত—পথ প্রদর্শন, সঠিক পথে চালনা।

১৬। **উসওয়া**—আদর্শ, অনুকরণযোগ্য, অনুসরণযোগ্য।

১৭। **উসওয়াতুন হাসানা**—সুন্দরতম আদর্শ, উৎকৃষ্টতম আদর্শ।

১৮। **মেইয়ার**—মাপকাঠি, মানদণ্ড।

১৯। **জামায়াত**—দল, সংগঠন।

২০। **ফতোয়া**—সিদ্ধান্ত, ঘোষণা, মতামত প্রকাশ, মন্তব্য প্রচার।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'দ্বীন' শব্দের ব্যাখ্যা

ইকামাতে দ্বীন সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে প্রথমে কুরআন পাকের আলোকে 'দ্বীন' শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন। দ্বীন শব্দটির একাধিক অর্থ রয়েছে। কুরআন মজীদে বিভিন্ন অর্থেই এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কোন শব্দের একাধিক অর্থ থাকলে সব অর্থ প্রত্যেক স্থানেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং একই অর্থ সবখানেও গ্রহণ করা চলে না। কোন্ স্থানে কী অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা পূর্ণ বাক্য থেকেই বুঝা যায়। যে বাক্যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঐ শব্দের অর্থ সঠিকভাবে বুঝবার উপায় নেই।

দ্বীন শব্দের কয়েকটি অর্থ কুরআন পাকে সুস্পষ্ট ঃ

এক ঃ প্রতিদান, প্রতিফল, বদলা ইত্যাদি।

দুই ঃ আনুগত্য বা اطَاعَةً বা হুকুম মেনে চলা।

তিন ঃ আনুগত্য করার বিধান نِظَامِ اطَاعَةً বা আনুগত্যের নিয়ম।

চার ঃ আইন বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা যে আইনে চলে, সমাজ ব্যবস্থাও বুঝায়।

কুরআন পাকের কয়েকটি আয়াত থেকে দ্বীন শব্দের এসব বিভিন্ন অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়।

এক ঃ প্রথম অর্থ প্রতিদান বা বদলা ঃ

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (সূরা ফাতেহা) অর্থ ঃ "প্রতিদান দিবসের মালিক।"

كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ "না, তা নয়, বরং তোমরা প্রতিদানকে মিথ্যা মনে কর।"–(সূরা ইনফিতার)।

এ জাতীয় আয়াতে দ্বীন অর্থ প্রতিদান, প্রতিফল, বদলা ইত্যাদি। আখেরাতে মানুষের কাজের যে বদলা দেয়া হবে তা-ই এখানে বুঝাচ্ছে।

দুই ঃ দ্বিতীয় অর্থ আনুগত্য ঃ

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

অর্থ ঃ "এরা কি আল্লার আনুগত্য ছাড়া অন্য কিছু চায় ? অথচ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবাই তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ করছে।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৩)

এখানে 'দ্বীন' শব্দটি আত্মসমর্পণ বা আনুগত্য অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। دَانَ শব্দের একটা অর্থ اَطَاعَ বা আনুগত্য করল। এ থেকে دِيْنَ মানে اِطَاعَة বা আনুগত্য।

فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ○ (الزمر : ٢)

অর্থ ঃ "আল্লার প্রতি আনুগত্যকে নিরংকুশ (খাস) করে তার দাসত্ব কর।"–(সূরা আয যুমার ঃ ২)

অর্থাৎ এমনভাবে আল্লার দাসত্ব কর যে, তিনিই তোমার একমাত্র মনিব ও আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী।

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ط - (البقرة : ١٩٣)

অর্থ ঃ "তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, যে পর্যন্ত ফিতনা শেষ না হয় এবং আনুগত্য শুধু আল্লারই বাকী থাকে।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৩)

এখানে ফিতনা অর্থ আল্লার আনুগত্যের পথে বাধা সৃষ্টিকারী ইসলাম বিরোধী শক্তি। জিহাদের নির্দেশ দিয়ে এখানে বলা হয়েছে যে, বিরোধী শক্তিকে এমনভাবে দমন কর যাতে আল্লার আনুগত্য করতে কেউ বাধা দিতে না পারে।

এ তিনটি আয়াত নমুনা স্বরূপ দেয়া হলো। কুরআনে এ জাতীয় আয়াত বহু আছে। তিন ধরনের তিনটি আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আনুগত্য-ই হলো দ্বীন শব্দের প্রধান অর্থ।

তিন ঃ তৃতীয় অর্থ আনুগত্যের বিধান বা পদ্ধতি ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ - (ال عمران : ١٩)

অর্থ ঃ "নিশ্চয় আল্লার নিকট একমাত্র ইসলামই আনুগত্যের বিধান (জীবন বিধান)।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯)

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج - (ال عمران : ٨٥

অর্থ ঃ "যে ইসলাম ছাড়া অন্য প্রকার আনুগত্যের বিধান চায় তার থেকে সেটা গ্রহণ করা হবে না।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৫)

অর্থাৎ আল্লার আনুগত্যের বিধান আল্লার নিকট একমাত্র ইসলামই।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ

اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط (الشورى : ١٣)

অর্থ ঃ "তোমাদের জন্য আনুগত্যের বিধান ধার্য করা হয়েছে যা নূহ (আ)-কেও নির্দেশ করা হয়েছিল এবং যা তোমার নিকট অহী করেছি এবং যা ইবরাহীম (আ), মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা দ্বীনকে কায়েম কর এবং এ বিষয়ে মতবিরোধ করো না।"–(সূরা আশ শূরা ঃ ১৩)

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক সব নবীকেই তার আনুগত্যের বিধানকে কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন।

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ لا -

(التوبة : ٣٣، فتح : ٢٨، الصف : ٩)

অর্থ ঃ "তিনি সে, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও আনুগত্যের একমাত্র সত্য বিধান সহ পাঠিয়েছেন যেন (রাসূল) তাকে (বিধান) আর সব রকমের আনুগত্যের বিধানের উপর বিজয়ী করেন।"
–(সূরা আস সফ ঃ ৯)

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ - المائدة : ٣

অর্থ ঃ "আজ তোমাদের আনুগত্যের বিধান (জীবন বিধান) পূর্ণ করে দিলাম।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৩)

অর্থাৎ জীবনে একমাত্র আল্লার আনুগত্যের বিধান যাতে পালন করা যায় এবং কোন ক্ষেত্রেই অন্য বিধান থেকে কিছু নিতে না হয় সেজন্য তোমাদের জীবন বিধান পূর্ণ করে দিলাম।

চার ঃ চতুর্থ অর্থ আইন, রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা ঃ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِىْ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ج اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ ـ (المؤمن : ٢٦)

অর্থ ঃ "ফিরাউন বললো, আমাকে ছাড়, আমি মূসাকে হত্যা করবো। সে তার রবকে ডেকে দেখুক। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের আইন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা বদলিয়ে দেবে অথবা (অন্ততপক্ষে) দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে।"–(সূরা মুমিন ঃ ২৬)

مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ ـ (يوسف : ٧٦)

অর্থ ঃ "বাদশার আইনে অন্য কাউকে ধরা যায় না। অর্থাৎ যে চুরি করেছে তাকেই ধরতে হবে। দেশের আইনে দোষীর বদলে অন্য কাউকে ধরা যায় না।"–(সূরা ইউসুফ ঃ ৭৬)

وَلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ ـ النور : ٢)

অর্থ ঃ "যদি তোমরা মুমিন হও তাহলে (যিনার শাস্তি দেবার সময়) আল্লার আইনের ব্যাপারে তোমাদের মনে তাদের প্রতি যেন দয়া না জাগে।"–(সূরা আন নূর ঃ ২)

এ কয়টি আয়াতে দ্বীন শব্দের যে কয় প্রকার অর্থ পাওয়া যায় তাতে মৌলিকভাবে আনুগত্যের উপরই গুরুত্ব বেশী বলে মনে হয়। একটি আয়াতে দ্বীন শব্দটিকে ক্রিয়াবাচক অর্থে ব্যবহার করে আনুগত্যের অর্থকে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে ঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ ـ (التوبة : ٢٩

অর্থ ঃ "তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান আনে না এবং আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তাকে হারাম গণ্য করে না এবং আল্লার দ্বীনের আনুগত্য করে না।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ২৯)

দ্বীন শব্দের ব্যাখ্যা প্রসংগে কুরআন পাকের এ ক'টি আয়াত থেকে পরিষ্কার হয়েছে যে, আল্লাহ পাক দুনিয়ার জীবনে মানুষকে সঠিক জীবন যাপনের জন্য যে বিধান ও পদ্ধতি নবীর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন তার মূল কথাই হলো আল্লার আনুগত্য।

দ্বীনের ব্যাপকতা ঃ

আল্লার আনুগত্যের যে বিধান হিসেবে দ্বীন ইসলামকে পাঠান হয়েছে তা মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্যই তৈরী করা হয়েছে। ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র, সমাজ ও আন্তর্জাতিক সব বিষয়ে যাতে মানুষ একমাত্র আল্লার সঠিক আনুগত্য করতে পারে সে উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক স্বয়ং ইসলামী জীবন বিধান রচনা করেছেন। সব দেশ, সব কাল ও সব জাতির উপযোগী জীবন বিধান রচনার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো হতেই পারে না।

আল্লার রচিত এ জীবন বিধানকে বাস্তব জীবনে কিভাবে পালন করা যায় এর সত্যিকার নমুনা মানব জাতির নিকট পেশ করার জন্যই রাসূল (সঃ)-কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কুরআন পাকে আল্লাহ পাক স্বয়ং এ ঘোষণা দিয়েছেন যে,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ـ (الاحزاب : ٢١)

অর্থ ঃ "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লার (সন্তুষ্টি) ও শেষ দিনের (মুক্তির) আকাংখা করে তাদের জন্য রাসূল (সঃ)-এর মধ্যে সুন্দরতম আদর্শ রয়েছে।"-(সূরা আল আহযাব ঃ ২১)

অর্থাৎ মানুষ হিসেবে দুনিয়ায় সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জীবনের নমুনা রাসূল (সঃ)-এর জীবনেই পাওয়া যায়।

যে কালেমায়ে তাইয়েবা কবুল করার মাধ্যমে ইসলামে দাখিল হতে হয় সে কালেমার মর্ম একথারই দাবী করে যে, আল্লার আনুগত্য সর্বব্যাপী।

২—

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ "আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ)- আল্লার রাসূল।" এ শব্দগুলো এমন কোনো মন্ত্র নয় যে, তা উচ্চারণ করলেই আল্লার নিকট মুসলিম বলে গণ্য হয়ে যাবে। কালেমার অর্থ বুঝে কালেমার মর্মের প্রতি বিশ্বাস না করলে ঈমানের দাবী পূরণ হতে পারে না।

কালেমায়ে তাইয়্যেবা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনের মূলনীতিই ঘোষণা করা হয়। যে ব্যক্তি এ কালেমা কবুল করে সে আসলে দুটো এমন নীতি কথা মেনে নেয় যা তার সারা জীবন আল্লার দেয়া বিধান অনুযায়ী চলার জন্য যরুরী।

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' দ্বারা ঘোষণা করা হয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম মানবো না—অর্থাৎ আল্লার হুকুমের বিরুদ্ধে কারো কথাই মানবো না। এটাই পয়লা নীতি বা পলিসি। হাদীসে একথাটিকে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ "স্রষ্টাকে অমান্য করে সৃষ্টিজগতে কারো আনুগত্য চলবে না।" অর্থাৎ আল্লার আনুগত্যের বিপরীত আর কারো হুকুম মানবো না—একথাই পয়লা নীতি।

কালেমা তাইয়েবার দ্বিতীয় অংশে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ)" কথাটিতে দ্বিতীয় নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এর মর্মকথা হলো, "আল্লার আনুগত্যের বাস্তব যে নমুনা রাসূল দেখিয়ে গেছেন একমাত্র সে নিয়মেই (তরীকা) আল্লার হুকুম মানবো। রাসূলুল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছ থেকে আল্লার আনুগত্য ও দাসত্বের নিয়ম গ্রহণ করবো না।"

এভাবে আল্লার হুকুম ও রাসূল (সঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী জীবনে চলার সিদ্ধান্তই কালেমার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এ সিদ্ধান্ত জীবনের সব ব্যাপারে পালন করাই কালেমার দাবী। কথায় ও কাজে, চিন্তায় ও বাস্তবে সবসময় এবং সব অবস্থায় এ নীতি মানবার ইচ্ছাই এ কালেমার মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়। এভাবে কালেমাকে বুঝে যারা কবুল করে তারাই প্রকৃত অর্থে মুসলিম। নাফসের দুর্বলতার দরুন বা শয়তানের ধোঁকার ফলে মুসলিম হয়েও আল্লার হুকুম বা রাসূলের তরীকা অমান্য করতে পারে। কিন্তু সবসময় ওসব বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করাই যে মুসলিমের কর্তব্য এবং কালেমার দাবী সে কথা সরল মনে স্বীকার

করতেই হবে—যদি কেউ ঈমানদার ও মুসলিম হিসেবে আল্লার নিকট গণ্য হতে চায়। এভাবে যে ইসলাম কবুল করে তার দ্বারা আল্লার হুকুম ও রাসূল (সঃ)-এর তরীকার বিরোধী কোন কাজ হয়ে গেলে সে অবশ্যই তাওবা করবে, মাফ পাওয়ার আশা করবে এবং আর এ অন্যায় না করার সংকল্প গ্রহণ করবে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবনই দ্বীন ইসলামের বাস্তব নমুনা

দ্বীন ইসলাম কতটা ব্যাপক তা শেষ নবী (সঃ)-এর বাস্তব জীবন থেকেই পরিষ্কার বুঝা যায়। তিনি আল্লার রাসূল হিসেবেই সব কাজ করতেন। মসজিদে ইমামতি করার সময় তিনি যেমন রাসূল ছিলেন, মদীনার রাষ্ট্রে পরিচালনার যাবতীয় কাজ করার সময়ও তিনি রাসূলই ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানেও তিনি রাসূল ছিলেন। অর্থাৎ তিনি যত কাজ করেছেন ও যত কথা বলেছেন তা রাসূল হিসেবেই করেছেন ও বলেছেন। ধর্মীয় বিষয়ে যেমন তিনি রাসূল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি ইত্যাদি বিষয়েও রাসূল হিসেবেই সবকিছু করেছেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর গোটা জীবনটাই ইসলামী জীবন এবং আল্লার দ্বীন বা আল্লার আনুগত্যের মধ্যে শামিল। অর্থাৎ রাসূলের জীবন যতটা ব্যাপক দ্বীন ইসলামও ততটা ব্যাপক। রাসূলকে সব অবস্থায় পূর্ণরূপে মেনে চলাই মুসলিম জীবনের কর্তব্য। শুধু ধর্মীয় বিষয়ে রাসূলকে মেনে চললেই ইসলামী জীবন গড়ে উঠে না।

মুসলিম হবার দাবীদার হয়েও যারা শুধু ধর্মীয় বিষয়ে রাসূলকে আদর্শ নেতা মেনে চলে কিন্তু রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ব্যাপারে রাসূলের বিপরীত নীতি ও চরিত্রের লোকদেরকে নেতা মানে, তারা কালেমার বিপরীত কাজই করে। শুধু তাই নয় এ জাতীয় লোকেরা আল্লাহকে জীবনের সবক্ষেত্রে মনিব মানতেই রাজী নয় এবং রাসূল (সঃ)-কে সব বিষয়ে নেতা মানতেও তৈরী নয়।

কতক লোক "ইসলামকে রাজনৈতিক ময়দানে টেনে আনার" বিরুদ্ধে কথা বলে। তারা ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মতো কতক আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মই মনে করে। তারা আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-এর উপর

"১৪৪ ধারা" জারী করতে চায় যাতে মসজিদের বাইরে আল্লাহ ও রাসূলকে মানতে না হয়। প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলামকেই মানতে রাযী নয়, যদিও তাদের মধ্যে কেউ কেউ কিছু ধর্ম-কর্মও করে থাকে। হয়তো ইসলামের ব্যাপকতা সম্পর্কে তাঁদের ধারণা নেই। এ জাতীয় লোকদেরকে "ধর্মনিরপেক্ষ" বলা হয়।

খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, পাকা দ্বীনদার হিসেবে সমাজে পরিচিত এক শ্রেণীর লোকও ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের মতো কথা বলে। তারা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, তাসবীহ, তেলাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের আনুগত্য করছেন। কিন্তু আইন-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, দেশ শাসন ইত্যাদি ব্যাপারেও আল্লার কুরআন ও রাসূল (সঃ)-এর সুন্নাতকে মানার চেষ্টা করা প্রয়োজন বলে তারা মনেই করেন না। কারণ তারাও দ্বীনের ব্যাপকতা সম্পর্কে সজাগ নন। সে হিসেবে তাদেরকেও ধর্মনিরপেক্ষ বলা চলে। কারণ তারাও ইসলামকে ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতি।

এসব ধার্মিক লোক ইসলামকে রাজনীতি বর্জিত ধর্ম মনে করে। তাঁদের নিকট রাসূল (সঃ) পরিপূর্ণ আদর্শ মানব হলে তাঁরা কিছুতেই এমন ভুল করতে পারতেন না। রাজনৈতিক ময়দানে কারো পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব হয় না। নির্বাচনে তো কোন পক্ষকে সমর্থন করতেই হয় এছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে কোন না কোন মতামত গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকে না। যারা ধার্মিক হয়েও রাজনীতির ময়দানে ইসলামের পক্ষে কাজ করেন না তাদের পক্ষে নির্বাচনে এবং জাতীয় ইস্যুতে অধার্মিক রাজনৈতিক দলের খপ্পরে পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একদল "ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে" বিশ্বাসী আর অন্যদল "রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মে" বিশ্বাসী। রাসূল (সঃ)-এর আনীত দ্বীন-ইসলামের দৃষ্টিতে উভয় দলই ভুল পথে আছেন।

"ইকামাতে দ্বীনের" মর্ম

اِقَامَةٌ শব্দটির আরবীতে কয়েকটি প্রতিশব্দ আছে ঃ

نَصَبٌ ـ تَأْسِيْسٌ ـ اِنْشَاءٌ ـ رَفْعٌ

رفع অর্থ উপরে উঠান, খাড়া করা, তুলে ধরা।

انشاء অর্থ তৈরী করা, অস্তিত্বে আনা, স্থাপিত করা।

تأسيس অর্থ প্রতিষ্ঠিত করা, প্রতিষ্ঠান কায়েম করা।

نصب অর্থ স্থাপন করা–যেমন খুঁটি।

ইকামাত শব্দের সহজ বোধ্য অর্থ হলো কায়েম করা, চালু করা, খাড়া করা, অস্তিত্বে আনা, প্রতিষ্ঠিত করা ইত্যাদি।

কুরআনে পাকে اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ কথাটি বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ "নামায কায়েম কর।" اِقَامَةُ الصَّلٰوةِ (ইকামাতুস সালাত) মানে নামায চালু করা। ফরয নামাযের পূর্বে মুয়ায্যিন ইকামাত দেয় বা তাকবীর বলে। এর শেষ দিকে বলা হয় قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ নামায খাড়া হয়ে গেছে বা নামায শুরু হয়েছে।

নামাযের মাসয়ালা শেখা, নামায জানা বা নামাযের ওয়ায করাকে ইকামাতে সালাত বলে না। বাস্তবে নামায চালু হয়ে যাওয়াকেই ইকামাতে সালাত বলে। কোন ব্যক্তির জীবনে নামায কায়েম হওয়ার অর্থ হলো যে, সে নিয়মিত, সময় মত, জামায়াতে সঠিক নিয়মে নামায আদায় করে। কোন মহল্লায় নামায কায়েম হওয়ার অর্থ মহল্লায় মসজিদ কায়েম হওয়া, পাঁচ ওয়াক্ত সেখানে জামায়াত চালু হওয়া এবং মহল্লার অধিকাংশ লোকের জামায়াতে শরীক হওয়া।

বাংলাদেশ কায়েম হওয়া অর্থ হলো বাস্তবে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ নামে একটি রাষ্ট্র স্থাপিত হওয়া। একটা কারখানা কায়েম হওয়া অর্থ কারখানা চালু হওয়া। ঠিক তেমনি দেশে দ্বীন ইসলাম কায়েম হওয়া অর্থ হলো সরকার ও জনগণের যাবতীয় কাজ-কর্ম কুরআন-হাদীস অনুযায়ী চলা।

"ইকামাতে দ্বীন" এমন একটি পরিভাষা যার অর্থ বাংলায় বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা যায়। "আল্লার দ্বীন কায়েম করা" বা "দ্বীন ইসলাম কায়েম

করা” বললে এর সহজ তরজমা হতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী হুকুমাত, ইসলামী সমাজ, নেযামে ইসলাম ইত্যাদির যে কোন একটা কথার সাথে “কায়েম করা” কথাটি যোগ করলে “ইকামাতে দ্বীন” পরিভাষাটিরই অর্থ বুঝায়।

ইকামাতে দ্বীনের মর্ম সঠিকভাবে বুঝবার জন্য বাস্তব উদাহরণ দরকার। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের উদাহরণ দিলেই বিষয়টা সহজ হবে। সবাই একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, বাংলাদেশে কুরআনের আইন ও রাসূলের আদর্শ কায়েম নেই। এ দেশটি ইসলামী রাষ্ট্র নয়। সরকারও ইসলামী নয়। দেশের ব্যবসা ও বাণিজ্য, ব্যাংক বীমা, আদালত ও ফৌজদারি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি, দেশীয় ও বৈদেশিক নীতি ইত্যাদির কোনটাই ইসলামী বিধান দ্বারা পরিচালিত নয়। কিন্তু এসবই তো চলছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যে, কোন্ আদর্শ, নীতি বা বিধান অনুযায়ী দেশের রাষ্ট্র, সরকার ও অন্যান্য সবকিছু চলছে ?

কুরআনের পরিভাষায় ইসলামী বিধানকে (دِيْنُ الْحَقِّ) বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লার আনুগত্য করাই “একমাত্র সত্য” পথ। সমাজে একজন অন্যজনের আনুগত্য না করলে কোন সমাজই চলতে পারে না। ইসলামের দাবী হলো যে, اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ “জেনে রাখ, আল্লাহ-ই সৃষ্টি করেছেন এবং হুকুম করার অধিকারও তাঁরই।-(সূরা আল আরাফ ঃ ৫৪) অর্থাৎ সবার কর্তব্য একমাত্র আল্লারই আনুগত্য করা। মানব সমাজে শান্তি ও সুশৃংখলা একমাত্র একজন মনিবের পূর্ণ আনুগত্যের উপরই নির্ভর করে।

আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হতে পারে না। আর কেউ নির্ভুলও নয়। সকলের মংগলে সত্য ও সঠিক বিধান শুধু তিনিই দিতে পারেন। তাই তার রচিত বিধান দ্বীন ইসলামই একমাত্র সত্য (الحق)। দ্বীনে হকের বিপরীত যা কিছু সবই অসত্য, ভুল ও ক্ষতিকর। আল্লার আনুগত্যের বিরুদ্ধে আর যত প্রকার আনুগত্য রয়েছে তা সবই “দ্বীনে বাতিল” বা মিথ্যা আনুগত্য। হকের বিপরীত পরিভাষাই হলো বাতিল।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী বাংলাদেশে যে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু রয়েছে তা দ্বীনে বাতিল। দ্বীনে হক যেখানে কায়েম নেই সেখানে যেটাই

চালু আছে সেটা অবশ্যই বাতিল। সে হিসেবে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও সরকার, সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিষ্ট ব্যবস্থা ইত্যাদি সবই "দ্বীনে বাতিল।"

আল্লাহ্ বলেন ঃ

ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً صلے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط - (البقرة : ٢٠٨

অর্থ ঃ "তোমরা পূর্ণরূপে ইসলাম গ্রহণ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২০৮

আল্লাহ্ বলতে চান যে, ইসলাম গ্রহণ করলে এর সবটুকুই গ্রহণ করতে হবে। তোমাদের ইসলাম গ্রহণে আমার কোন লাভ নেই। তোমাদের পসন্দ মতো ইসলামের একাংশ গ্রহণ করে অন্য অংশ ত্যাগ করলে ইসলাম গ্রহণ করা হলো না। আমার আনুগত্য করতে হলে সব ক্ষেত্রেই আমাকে মনিব হিসেবে মেনে নাও। যেখানেই তোমরা ইসলামকে বাদ দিবে সেখানেই তোমরা শয়তানের অনুসারী হবে।

এজন্যই কোন ব্যক্তি যদি ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইসলামকে মানে কিন্তু রাজনৈতিক ময়দানে ধর্মনিরপেক্ষ হয় এবং অর্থনীতি ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রী বা পুঁজিবাদী হয় তাহলে সে ইসলামকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করেনি বলেই বুঝা যাবে। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র বিসমিল্লাহ্ ও আল্লার প্রতি আস্থার কথা লেখা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র নয়। কারণ 'দ্বীনে হক' এ দেশে চালু নেই। যেটা চালু আছে সেটা সাধারণ যুক্তিতেই দ্বীনে বাতিল, এ বাতিল ব্যবস্থা ইংরেজ আমল থেকেই রয়েছে। দ্বীনে বাতিলই এখানে দু'শ বছর থেকে বিজয়ী হয়ে আছে।

বাংলাদেশে দ্বীনে হকের অবস্থা ঃ

যেখানে দ্বীনে বাতিল কায়েম বা বিজয়ী আছে সেখানে দ্বীনে হকের অবস্থা কিরূপ হওয়া স্বাভাবিক? দ্বীনে হক সেখানে দ্বীনে বাতিলেরই অধীনে রয়েছে। অর্থাৎ দ্বীনে হক বাংলাদেশে ততটুকুই বেঁচে আছে যতটুকু দ্বীনে বাতিল অনুমতি দিয়েছে। দ্বীনে হকের ততখানি অংশই চালু আছে যতটুকুতে দ্বীনে বাতিলের আপত্তি নেই। অর্থাৎ ইসলাম এ দেশে ঐ পরিমাণেই টিকে আছে যেটুকুতে বাতিল বাধা দেয় না।

বাতিল সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিপূর্ণ ইসলামকে কখনও সহ্য করতে রাযী হতে পারে না। বাতিল সমাজের কর্তারা ইসলামের ততটুকু অংশকেই সহ্য করে যতটুকুতে দ্বীনে বাতিলের কোন ক্ষতি না হয়। বাংলাদেশে ইসলামের যেসব খেদমত হচ্ছে তাতে বাতিল যদি শংকিত হতো তাহলে এসবকে সহ্য করতো না। মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, ওয়ায ও তাবলীগ দ্বারা বাতিল সমাজ ব্যবস্থা উৎখাত হবার কোনো ভয় নেই বলেই এসব ইসলামী কাজকে বাধা দেয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ বাতিলের পক্ষ থেকে আপত্তি নেই বলেই এগুলো টিকে আছে। বাতিলের সাথে এ সবের কোন টক্কর বা সংঘর্ষ নেই।

বাংলাদেশে দ্বীন ইসলামের কী দশা তা সামান্য আলোচনা দ্বারাই স্পষ্ট হবে। ইসলাম পূর্ণাংগ একমাত্র জীবন বিধান। ইসলামকে যদি বিরাট একটি দালানের সংগে তুলনা করা হয় তাহলে কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত সে বিরাট বিল্ডিং-এর ভিত্তি মাত্র। রাসূলুল্লাহ (সঃ) একথাই বলেছেন ঃ بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ অর্থাৎ কালেমা, নামায ইত্যাদি পাঁচটি জিনিস দ্বারা ইসলামী জীবন বিধানের ভিত্তি রচিত হয় মাত্র। এ ভিত্তিটুকুই শুধু ইসলাম নয়। ইসলামের মহান সৌধের সঠিক ধারণা আজ আলেম সমাজের মধ্যেও সকলের নেই। বাংলাদেশে ইসলামের গোটা বিল্ডিং-এর তো কোন অস্তিত্বই নেই। শুধু ভিত্তিটুকুর অবস্থাই আলোচনা করে দেখা যাক যে বাংলাদেশে দ্বীনে হকের অবস্থা কত করুণ ঃ

কালেমা তাইয়েবা যে গোটা জীবনের চিন্তা ও কাজের ব্যাপারে নীতি-নির্ধারণী কথা এবং কালেমা কবুল করার অর্থ যে পূর্ণ জীবনে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করার ওয়াদা–একথা দ্বীনদার বলে পরিচিত মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে জানে না। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোথাও কালেমার এ ব্যাপক অর্থ শেখান হয় না। শিক্ষিত সমাজ যদি কালেমার এ মর্ম না জানে তাহলে এ দোষ কার ? দেশের সরকার ও শিক্ষাব্যবস্থাই কি এ জন্য দায়ী নয় ?

দ্বীন ইসলামের পয়লা সঠিক পাঠ-ই কালেমা তাইয়েবা। যে নীতি অনুযায়ী গোটা জীবন যাপন করতে হবে তা-ই যদি শেখার কোন ব্যবস্থা না হয় তাহলে মানুষ ইসলামকে জীবনে কি করে পালন করবে ?

এরপর নামায হলো দ্বিতীয় ভিত্তি। আল্লাহ পাক মুসলিমদের উপর পাঁচ ওয়াক্তের নামায জামায়াতের সাথে ফরয করেছেন। ফরয মানে হলো অবশ্য কর্তব্য বা অপরিহার্য দায়িত্ব। আল্লাহ নামাযকে ফরযের গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের সমাজে নামাযের পজিশন কী ? সাধারণভাবে এ দেশে নামায মুবাহ অবস্থায় আছে। অর্থাৎ করলে ক্ষতি নেই এবং না করলেও দোষ নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে নামায পড়া মাকরূহ বা অপসন্দনীয়। পিয়ন জামায়াতে যেয়ে নামায পড়ে, বেনামাযী অফিসার এতে বিরক্ত হয়। কোথাও কোথাও নামায পড়া হারাম বা নিষিদ্ধ। ডিউটি থাকাকালে নামায কাযা করতে বাধ্য হতে হয়। দ্বীনে বাতিলের অধীনে নামাযের জন্য আল্লার দেয়া এ হুকুমের সাথে এরূপ ব্যবহার করাই স্বাভাবিক। যদি দ্বীনে হক এ দেশে কায়েম থাকতো তাহলে নামাযকে ফরয হিসেবেই মর্যাদা দেয়া হতো। সর্বত্র সবাই যাতে নামায ঠিক মতো আদায় করতে পারে সে ব্যবস্থা করা হতো। কর্তারা নিজে নামায নিয়মিত আদায় করতো এবং নামায যে কালেমার নীতি অনুযায়ী জীবন যাপনের শিক্ষা দেয় তা নামাযীদের জীবনে বাস্তবে দেখা যেতো।

সমাজে রোযার অবস্থা কী ? ইসলামের এ ভিত্তিটিও নামাযের মতোই 'মুবাহ' অবস্থায় আছে—অথচ আল্লাহ পাক রমযান মাসের রোযাকে ফরয করেছেন। দ্বীনে হক কায়েম থাকলে সমাজে এমন পরিবেশ সৃষ্টি হতো যার ফলে দিনের বেলা হোটেলের দরযায় পর্দা ঝুলিয়ে খাওয়ার মতো মুনাফেকী করা কোন মুসলমানের পক্ষে সম্ভব হতো না।

রোযার উদ্দেশ্য যে নৈতিক উন্নয়ন, বর্তমানে সে নৈতিকতার কোন মূল্যই সমাজে নেই। প্রবৃত্তির দাসত্ব করার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা করাই যেন দেশের নেতা ও কর্তাদের আসল কাজ। প্রবৃত্তিকে দমন করে বিবেকের শক্তি বৃদ্ধি করা রোযার অন্যতম বড় উদ্দেশ্য। ভাল ও মন্দের বিচার-জ্ঞান দিয়ে মানুষকে তৈরী করা হয়েছে। তাই মানুষকে বিবেকবান হিসেবে গড়ে তুলবার জন্যই রোযার প্রয়োজন। কিন্তু দ্বীনে বাতিলের নিকট বস্তুগত সুখ ও প্রবৃত্তির পূজা-ই বড়। তাই "রমযানের পবিত্রতা রক্ষার" লোক দেখান কিছু অভিনয় চলে।

এবার হজ্জের অবস্থা দেখা যাক। যাদের হজ্জ করা উচিত তাদের উপর আল্লার নির্দেশ যে, মক্কা শরীফে যেয়ে হজ্জ আদায় করতে হবে। কিন্তু আল্লার এ আদেশটি দ্বীনে বাতিলের অধীন। বাতিল যদি অনুমতি না

দেয় তাহলে হজ্জে যাওয়া যাবে না। যদি দ্বীনে হক দেশে কায়েম থাকতো তাহলে যাদের হজ্জে যাবার ক্ষমতা আছে তাদেরকে সরকারীভাবে হজ্জে যাবার জন্য তাকিদ দেয়া হতো।

যাকাতের অবস্থা আরও করুণ। প্রকৃতপক্ষে ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা হলো সামাজিক নিরাপত্তার (Social security) বিধান। যাদের প্রয়োজনের চেয়ে আয় কম এবং কোন না কোন কারণে যারা অভাবগ্রস্ত ও ঋণী হয়ে পড়েছে তাদের জন্য ইসলামী সরকারের দায়িত্ব হলো যাকাত দেয়ার যোগ্য লোকদের নিকট থেকে যাকাতের টাকা আদায় করে যাকাত গ্রহণের যোগ্য লোকদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া। যাকাত অন্যান্য ট্যাক্সের মতো নয়। যে কোন সরকারী কাজে যাকাতের টাকা খরচ করার অনুমতি নেই। কুরআনে খরচের যে আটটি খাতের উল্লেখ আছে তার বাইরে যাকাতের টাকা খরচ করার কোনো অধিকার সরকারের নেই। যাকাত ব্যবস্থা ঠিকমতো চালু করা হলে সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি ও বেকার সমস্যা থাকতেই পারে না।

কিন্তু দ্বীনে হক চালু নেই বলে যাকাতের মতো মহান ব্যবস্থাটিও ইসলামের কলংক বলে ধারণা হওয়ার কারণ ঘটেছে। বর্তমান বাতিল সমাজ ব্যবস্থায় যে নিয়মে যাকাত চালু আছে তাতে মনে হয় যে, যাকাত যেন গরীবের প্রতি ধনীদের দয়ার ভিক্ষা। প্রকৃতপক্ষে ইসলামে যাকাত হলো ধনীদের উপর আল্লাহর ধার্য করা কর্তব্য এবং গরীবদের পক্ষে আল্লাহর বরাদ্দ করা অধিকার। ইসলামী সরকার যাকাত উসুল করে যথানিয়মে বিলি বণ্টনের ব্যবস্থা করলে অত্যন্ত সম্মানের সাথে প্রাপকরা পেতে পারে। বর্তমানে যারা যাকাত পায় তারা অপমানজনকভাবেই দাতাদের অনুগ্রহ হিসাবে তা পাচ্ছে।

ইসলামের পাঁচটি মূল ভিত্তিরই এখানে যে দুর্দশা তা থেকেই অনুমান করা যায় যে, গোটা ইসলামী জীবন বিধানের মর্যাদা এখানে কী। ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী সবার অন্তরে দ্বীনে হকের যত উচ্চ মর্যাদাই থাকুক, বাস্তবে এ দেশে যে দ্বীনে বাতিলের অধীনে ইসলামের নামটুকু মাত্র বেঁচে আছে তা ইসলাম দরদীরাই উপলব্ধি করতে সক্ষম।

যেটুকু ইসলাম বেঁচে আছে তা দ্বীনি মাদ্রাসাগুলোরই বিশেষ অবদান। এসব মাদ্রাসা না থাকলে কুরআন ও হাদীসের কোন চর্চাই থাকতো না।

মুসলিম জনগণের সাহায্য না হলে এসব মাদ্রাসার অস্তিত্বই অসম্ভব হতো। বাতিলের অধীনে এটুকু বেঁচে থাকাটাও বড় সৌভাগ্যের কথা।

দ্বীনে হক কায়েম হলে বাতিলের অবস্থা কী হয় ?

যেখানে দ্বীনে বাতিল কায়েম আছে সেখানে যেমন দ্বীনে হক বাতিলের অধীন হয়ে থাকতে বাধ্য হয়, তেমনি দ্বীনে হক কায়েম হলে বাতিলকেই হকের অধীন হতে হয়। আল্লাহ পাক বাতিলকে খতম করার হুকুম দেননি। তিনি হককে বিজয়ী করার নির্দেশ দিয়েছেন। হক বিজয়ী হলে বাতিলকে ততটুকুই বেঁচে থাকার অধিকার ও সুযোগ দেয়া হবে যতটা হকের জন্য ক্ষতিকর নয়। যেমন বর্তমানে দ্বীনে হক ততটুকুই টিকে আছে যতটুকুতে বাতিলের আপত্তি নেই বা যতটুকু থাকলে দ্বীনে বাতিলের কোন বিশেষ ক্ষতি হয় না।

দ্বীনে হক কায়েম হলে বাতিল ধর্ম খতম হয়ে যাবে না। যারা অন্য ধর্ম পালন করতে চায় তাদেরকে বাধা দেয়া যাবে না। মন্দির, গির্জা ইত্যাদির হেফাযত করতে হবে। কারণ ধর্মের উপর শক্তি প্রয়োগ কুরআনে নিষেধ। ধর্ম মনের ব্যাপার। জোর করে ইসলাম কবুল করালে মনের দিক থেকে বিদ্রোহ থেকে যাবে। মনের উপর জোর খাটে না। তাই ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় রাখা যরুরী।

কিন্তু খৃস্টান বা ইয়াহুদীরা যদি ইসলামী রাষ্ট্রে সূদের ব্যবসার অনুমতি চায় বা কালচারের নামে প্রকাশ্যভাবে অশ্লীলতা ও নগ্নতা চালু করতে চায় তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র এর অনুমতি দেবে না। এসব যেহেতু ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও নৈতিক পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে সেহেতু এসবকে সহ্য করা সম্ভব হবে না।

আল্লাহ পাক মানুষকে যে উন্নত নৈতিক সত্তা হিসেবে মর্যাদা দিতে চান তা একমাত্র দ্বীনে হকের অধীনেই সম্ভব। মানুষের মধ্যে পশুত্বের প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে আরও আস্কারা দেয়ার জন্য দ্বীনে বাতিলের পক্ষ থেকে বস্তুগত অদ্ভূত অদ্ভূত দর্শন সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে মানুষ পশুর চেয়ে অধম ও জঘন্য চরিত্রের পরিচয় দিচ্ছে।

দ্বীনে হক বিজয়ী হলে মানুষকে সত্যিকার মানুষের মর্যাদায় উন্নীত করার জন্য আল্লাহ পাকের দেয়া বিধানকে বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব

হবে। বিশ্বনবী সেকালে দুনিয়ার সবচেয়ে অসভ্য ও নিকৃষ্ট মানব সমাজকে দ্বীনে হকের মাধ্যমেই ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ও সভ্যতম সমাজে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব ঃ

দ্বীনকে কায়েম করার দায়িত্ব কার ? আল্লাহ্ পাক এ দায়িত্ব দিয়েই রাসূল (সঃ)-কে পাঠিয়েছেন। যেমন কুরআন পাকের তিনটি সূরায় এ বিষয়ে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِىٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ -

(التوبة : ٣٣، الفتح : ٢٨، الصف : ٩)

"তিনিই সে সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও একমাত্র হক দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন যেন (সে দ্বীনকে) আর সব দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন।"—(সূরা আত তাওবা ঃ ৩৩, সূরা ফাতহ ঃ ২৮, সূরা আস সফ ঃ ৯)

কিন্তু এ দায়িত্ব কি শুধু রাসূলেরই ! রাসূলের প্রতি যারা ঈমান এনেছিলেন তারা কি শুধু নামায, রোযা ও অন্যান্য কতক ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করাই নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে করতেন ? কুরআন ও হাদীস একথার সাক্ষী যে, প্রত্যেক ঈমানদারকেই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর "ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব" পালনে জান ও মাল দ্বারা পূর্ণরূপে শরীক হতে হতো। রাসূল (সঃ)-এর ইমামতিতে মদীনার মসজিদে জামায়াতে নামায আদায়কারী এক হাজার লোক নিয়ে আল্লার রাসূল (সঃ) ওহুদের যুদ্ধে রওয়ানা হলেন। কিছুদূর যেয়ে আবদুল্লাহ বিন উবাই-এর নেতৃত্বে তিন শ' লোক যুদ্ধে শরীক না হয়ে ফিরে এলো। আল্লাহ্ পাক এদেরকে মুনাফিক বলে ঘোষণা করলেন। তাবুকের যুদ্ধে তিনজন সাহাবী যথাসময়ে রওয়ানা না হওয়ায় এবং পরে রওয়ানা হবার নিয়ত তাদের থাকা সত্বেও রাসূলের নির্দেশে তাদেরকে মুসলিম জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন ঘোষণা করা হলো। এমনকি তাদের বিবি বাচ্চাকে পর্যন্ত তাদের সাথে কথা বলা বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হলো। এ অবস্থায় দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন তাওবা করার পর আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ক্ষমা করলেন।

এ থেকে নিসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলের দায়িত্ব পালনে পূর্ণভাবে শরীক হওয়া ঈমানের অপরিহার্য দাবী। তাহলে বুঝা গেল যে, ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব প্রত্যেক মুসলিমেরই। রাসূলের এ মহান দায়িত্বে শরীক না হলে ঈমান আনার প্রয়োজনই কি ছিল ? কুরআনে রাসূলের মুখ দিয়েই বলান হয়েছে যে ঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ـ (الشعراء : ١٥٠)

অর্থ ঃ "আমাকে ভয় করে চল এবং আমার আনুগত্য কর।"
-(সূরা শূয়ারা ঃ ১৫০)

অর্থাৎ রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করার মাধ্যমেই আল্লার আনুগত্য করা সম্ভব।

আল্লাহ পাক যত হুকুম করেছেন তা বাস্তবে মানব সমাজে তখনই চালু হতে পারে যখন দ্বীনে হক কায়েম হয়। কোন ফরযই দ্বীনে বাতিলের অধীনে ফরযের মর্যাদা পায় না। ইকামাতে দ্বীন ছাড়া কোন হারামই সমাজ থেকে উৎখাত হতে পারে না। তাই আল্লার রাসূল (সঃ) যত ফরয কায়েম করতে পেরেছিলেন তা ইকামাতে দ্বীনের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। দ্বীন কায়েম করতে না পারলে কোন ফরযই সমাজে চালু করতে পারতেন না। সুতরাং ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্বটিই সব ফরযের বড় ফরয। ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্বকে অগ্রাহ্য করে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি কোন ফরযকেই ঠিকভাবে সমাজে কায়েম করা সম্ভব নয়। তেমনি দ্বীন কায়েম করা ছাড়া সমাজ থেকে খারাবী ও অন্যায়কে উৎখাত করা যায় না।

তাহলে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব (ফরিযায়ে ইকামাতে দ্বীন) প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। অর্থাৎ দ্বীনকে কায়েম বা বিজয়ী করার চেষ্টা করা "ফরযে আইন"। অবশ্য দ্বীন বিজয়ী হয়ে গেলে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালক সরকারের উপরই দ্বীনকে কায়েম রাখার দায়িত্ব থাকে। তখন এটা সাধারণ মুসলিমদের জন্য "ফরযে কিফায়া" হয়ে যায়। কিন্তু দ্বীনে বাতিলকে পরাজিত করে দ্বীনে হককে বিজয়ী করার দায়িত্বটি অবশ্যই "ফরযে আইন"। আল্লার রাসূল (সঃ)-কে اسوة حسنة (উৎকৃষ্টতম আদর্শ) ও সাহাবায়ে কেরামকে অনুকরণ যোগ্য মনে করলে একথা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই।

সব ফরযের বড় ফরয হিসেবে ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্বকে বুঝবার পর কারো পক্ষেই ইসলামের কতক মূল্যবান খেদমত করেই সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব নয়। অবশ্য এ দায়িত্বের অনুভূতিই যাদের নেই তাদের কথাই আলাদা। নাজাত দেয়ার মালিক যে মহান আল্লাহ তিনিই তাদের হাল জানেন এবং তিনি কারো উপর অবিচার করবেন না–একথা নিশ্চিত। কিন্তু আল্লাহ পাক যাদেরকে ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব (ফরিযা) বুঝবার যোগ্যতা দিয়েছেন তাদের পক্ষে এ বিষয়ে অবহেলা করা স্বাভাবিক নয়। মাদ্রাসা, খানকাহ ও তাবলীগের মাধ্যমে দ্বীনের যতটুকু খেদমত হচ্ছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা তাদের পক্ষে অসম্ভব।

একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, মাদ্রাসা, ওয়ায, খানকাহ ও তাবলীগ দ্বারা দ্বীনের বড় বড় খেদমত হচ্ছে। এসব খেদমতই ইকামাতে দ্বীনের জন্য বিশেষ সহায়ক। কিন্তু খেদমতগুলো দ্বারা আপনা আপনিই দ্বীন কায়েম হতে পারে না। দ্বীন কায়েমের কর্মনীতি (তারীকে কার) ও কর্মসূচী শুধু খেদমত পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না। ইকামাতে দ্বীনের প্রচেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই একটি বিপ্লবী আন্দোলনের রূপ লাভ করে। এ প্রচেষ্টাকেই তাই ইসলামী আন্দোলন বা "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ" বলা হয়।

রাসূল (সঃ) কি দায়িত্বের অতিরিক্ত কাজ করেছেন ?

শেষ নবী ও বিশ্ব নবী (সঃ) বাতিলের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম করে নিজেও চরম নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও জান-মালের অবর্ণনীয় ক্ষতি স্বীকার করতে রাযী করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের প্রথম তের বছরে একদল যোগ্য সহকর্মী তৈরী করার পর মদীনায় বিজয় যুগ শুরু হয়। এ বিজয়ও স্থিতিশীল হতে আট বছর লেগে যায়। কুরাইশদের নেতৃত্বে গোটা আরব শক্তি বারবার মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রটিকে খতম করার চেষ্টা করেছে। ষষ্ঠ হিজরীর শেষভাগে হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে কুরাইশদের আক্রমণ বন্ধ হয় এবং অষ্টম হিজরীর রমযানে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লব স্থিতিশীল হয়।

গোটা আরবে ইসলামের বিজয় হবার পরও পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের আক্রমণ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য রাসূল (সঃ)-কে অনেক

ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। চারপাশের সব রাষ্ট্রের কর্তাদেরকে তিনি ইসলাম কবুলের দাওয়াত দিয়েছেন এবং দাওয়াত কবুল না করলে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনতা স্বীকার করার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ্ দ্বীন ইসলামের যে দায়িত্ব রাসূলের উপর দিয়েছিলেন তার চেয়ে অতিরিক্ত কোন কাজ কি তিনি করেছেন ? ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা, এ রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করা, এ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকার গঠন করা, দেশের প্রচলিত আইনের বদলে কুরআনের আইন চালু করা, ইনসাফপূর্ণ বিচার-ব্যবস্থা কায়েম করা, আল্লার দেয়া রিযক থেকে যাতে কেউ বঞ্চিত না থাকে এমন অর্থনৈতিক বিধান জারী করা ইত্যাদি অগণিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজ তিনি করেছেন। এ কাজগুলো কি ইসলামী দায়িত্ব হিসেবেই তিনি করেননি ?

আল্লার রাসূলই হচ্ছেন দ্বীন ইসলামের আদর্শ। এসব কাজ যদি তিনি দ্বীনের দায়িত্ব হিসেবে নিজেই করে থাকেন তাহলে এগুলোর গুরুত্বকে অবহেলা করলে দ্বীনদারীর ক্ষতি হবে কি না ? বিস্ময়ের বিষয় যে, দ্বীনদারীর দোহাই দিয়েই দ্বীনের এসব দায়িত্বকে অগ্রাহ্য করা হয়। বাতিলকে পরাজিত করে দ্বীনে হককে বিজয়ী করার দ্বীনি দায়িত্বই যে আসল কাজ এবং সে কাজের যোগ্য হবার জন্যই যে, নামায, রোযা, যিকর ইত্যাদির দরকার, যদি দ্বীনদার লোকেরাই সে কথা না বুঝে তাহলে দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার দায়িত্ব কারা পালন করবে ?

মাদ্রাসায় যারা কুরআন ও হাদীসের ইলম বিতরণ করছেন, খানকায় যারা দ্বীনের তালকীন দিচ্ছেন, ওয়াযের মাহফিলে যারা জনগণের মধ্যে দ্বীনের আলো ছড়াচ্ছেন, তাবলীগের মারফতে যারা মানুষকে আখিরাতের ফিকর শিখাচ্ছেন—তারাই তো দ্বীনের প্রকৃত খাদেম এবং পতাকাবাহী। তাই ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব বুঝবার ক্ষমতা তাদেরই সবচেয়ে বেশী। তাই যারা দ্বীনের এতটুকু খেদমতও করে না তারা রাসূল (সঃ)-এর ইকামাতে দ্বীনের কঠিন দায়িত্ব কী করে অনুভব করবে ?

এজন্যই দ্বীনের সকল প্রকার খেদমতে নিযুক্ত সমস্ত মুখলিসীনে দ্বীনের নিকট আমার আকুল আবেদন যে, আপনারা ইকামাতে দ্বীনের এ যিম্মাদারী সম্পর্কে খোলা মনে চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন। যদি আমি ভুল

বুঝে থাকি কুরআন, হাদীস ও রাসূল (সঃ)-এর জীবন থেকে যুক্তি দিয়ে আমার ভুল ধারণা দূর করতে সাহায্য করুন। আমাদের সবাইকে আল্লারই নিকট হাযির হতে হবে। সেখানে যেন আমাদেরকে লজ্জিত হতে না হয় সেটাই বড় কথা।

সাধারণত এ দায়িত্ব পালন না করার অজুহাত হিসেবে কতক বড় বড় দ্বীনদার ব্যক্তির দোহাই দিয়ে বলা হয় যে, তাঁরা কি এ দায়িত্বের কথা বুঝেননি ? তাঁরা এ কাজ না করার কারণে কি আখিরাতে নাজাত পাবেন না ? এ জাতীয় অজুহাত যারা তালাশ করেন তাদেরকে বুঝাবার সাধ্য কারো নেই। আল্লার রাসূল যদি আদর্শ হয়ে থাকেন তাহলে তাঁকেই অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। অন্য কোন আলেম, বুযর্গ বা দ্বীনদার লোককে রাসূলের মুকাবিলায় দলীল হিসেবে পেশ করা একেবারেই অন্যায়।

আমাদের প্রত্যেককেই আদালতে আখিরাতে নিজ নিজ কাজের হিসেব দিতে হবে। "ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব অমুক বড় আলেম পালন করেননি বলে আমিও পালন করা দরকার মনে করিনি"—এ খোঁড়া যুক্তি সেখানে কোন কাজে আসবে না। রাসূল (সঃ)-কে সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা সে প্রশ্নই সেখানে করা হবে। এর উপরই নাজাত নির্ভর করবে। কোন আলেমের দোহাই দিয়ে এ প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার কোন উপায়ই থাকবে না।

❐

ইসলামী আন্দোলনের চিরন্তন কর্মপদ্ধতি

একথা সত্য যে, প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অনুযায়ী সে দেশে ইসলামী আন্দোলনের বিস্তারিত কর্মসূচী রচিত হয়। কিন্তু আন্দোলনের মূল কর্মপদ্ধতি সবদেশে সর্বকালে একই। এটা এমন স্থায়ী কর্মপদ্ধতি যা আল্লার নবী ও রাসূলগণকে পর্যন্ত অনুসরণ করতে হয়েছে। দুনিয়ায় যে কোন আদর্শ কায়েমের এটাই একমাত্র স্বাভাবিক কর্মপদ্ধতি। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ আদর্শ যতই নিখুঁত হোক, কোন আদর্শ নিজে নিজে সমাজে কায়েম হতে পারে না। এমন একদল নেতা ও কর্মী বাহিনী তৈরী হওয়া প্রয়োজন যারা সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে ঐ আদর্শ বাস্তবে কায়েম করার যোগ্য।

দুই ঃ এ ধরনের যোগ্য নেতা ও কর্মী দল আসমান থেকে নাযিল হয় না। মানব সমাজ থেকেই এদেরকে সংগঠিত করে গড়ে তুলতে হয়। আদর্শের আন্দোলন যখন মানুষের নিকট তাঁর দাওয়াত দিতে থাকে তখন সমাজে ঐ আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হবার উপযোগী লোকেরা এগিয়ে আসে। আন্দোলনের পরিচালকগণ তাদেরকে সংগঠিত করে এক বিশেষ কর্মসূচীর মাধ্যমে তাদের মন, মগয ও চরিত্র ঐ আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তুলেন।

তিন ঃ প্রত্যেক সমাজেই যেহেতু কোন বিধান প্রচলিত থাকে এবং সমাজপতিরা (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃত্ব) সে ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে তাদের স্বার্থ কায়েম রাখে, সেহেতু নতুন কোন আদর্শের আন্দোলনকে তারা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সাথে কায়েমী স্বার্থের এ সংঘর্ষ প্রত্যেক নবীর জীবনেই দেখা গেছে। এ সংঘর্ষ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও যরুরী। এ সংঘাতই কর্মীদের জন্য সত্যিকার পরীক্ষা। সমাজে সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েও এবং কায়েমী স্বার্থের জেল, জুলুম ও নির্যাতন বরদাশত করেও যারা আন্দোলনে টিকে থাকে তারাই এ আদর্শের যোগ্য বলে প্রমাণিত। এ স্বাভাবিক পরীক্ষা ছাড়া উপযোগী লোক বাছাই করার অন্য কোন উপায় নেই।

৩—

চার ঃ আন্দোলনের যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী তৈরীর এ চিরন্তন পদ্ধতি অবশ্যই সময় সাপেক্ষ। হঠাৎ অল্প সময়ে এটা কিছুতেই হতে পারে না। তাই বিশ্ব নবীকে দীর্ঘ ১৩টি বছর ব্যক্তি গঠন পর্যায়ে মদীনায় হিজরাতের পূর্ব পর্যন্ত কায়েমী স্বার্থের সাথে সংঘর্ষ করতে হয়েছিল। নবীর কর্মী বাহিনীকে শেষ পরীক্ষা দিতে হয়েছিল হিজরাতের মাধ্যমে। ইসলামের খাতিরে এমনভাবে যারা বাধ্য হয়ে বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ ও জন্মভূমি ত্যাগ করেছিলেন তাঁরা প্রমাণ দিলেন যে, তাঁদের হাতেই দ্বীন ইসলামের বিজয় সম্ভব। কারণ দুনিয়ার সবকিছুই একমাত্র আদর্শের জন্য তাঁরা ত্যাগ করতে পারেন। এভাবে আন্দোলনের মারফতে একদল ত্যাগী ও নিঃস্বার্থ কর্মীদল সৃষ্টি করতে বেশ কিছু সময় লাগা স্বাভাবিক।

পাঁচ ঃ ব্যক্তি গঠনের এ পর্যায় অতিক্রম করার পরই সমাজ গঠনের সুযোগ হতে পারে। ব্যক্তি গঠনের স্তরকে সংগ্রাম যুগও বলা যায়। সংগ্রাম যুগে তৈরী লোকদের হাতে কোথাও ক্ষমতা অর্পিত হলে আন্দোলনের বিজয় যুগ শুরু হয় এবং তখনি সমাজ গঠন সম্ভব হয়। হিজরাতের পর মদীনায় এ সুযোগই রাসূল (সঃ) পেয়েছিলেন।

আদর্শ কায়েমের যোগ্য লোকের হাতে যে পর্যন্ত নেতৃত্ব না আসে সে পর্যন্ত আদর্শ বাস্তবে কায়েম হতে পারে না। যারা ইসলামকে জানে না বা জানলেও নিজেদের জীবনে মানে না, তাদের দ্বারা কি করে ইসলাম কায়েম হতে পারে ? যারা নিজেদের ব্যক্তি জীবনে ইসলাম কায়েমে ব্যর্থ তারা সমাজে ইসলামের খেদমতের যোগ্যতাই রাখে না।

ছয় ঃ ইসলামের খেদমত ও ইসলামী আন্দোলনে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের সাথে প্রচলিত ক্ষমতাসীন ও কায়েমী স্বার্থের সংঘর্ষ অনিবার্য। কিন্তু ইসলামের যেসব খেদমত সম্পর্কে কায়েমী স্বার্থ বিচলিত নয় সে সবের সংগে তাদের সংঘাত হয় না। ইসলামের ঐসব খেদমত পরোক্ষভাবে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলামী আন্দোলনের সহায়ক হতে পারে। কিন্তু এসব খেদমত প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে বদলিয়ে দিতে পারে বলে আশংকা না করলে কায়েমী স্বার্থ তাদেরকে বাধা দেয় না। যদি কোন দাওয়াত ও কর্মসূচী সম্পর্কে কায়েমী স্বার্থের ধারণা হয় যে, তা দ্বারা তাদের পরিচালিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে

জনশক্তি গড়ে উঠবে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তারা সে আন্দোলনকে বরদাশত করে না।

সত্যিকার পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন প্রকৃতিগতভাবেই বিপ্লবাত্মক। আল্লার দাসত্ব ও রাসূল (সঃ)-এর নেতৃত্বের ভিত্তিতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে গঠন করার বিপ্লবী কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচীই নবীদের প্রধান সুন্নাত। আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্যহীন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনই ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য। এ আন্দোলনকেই কুরআন পাকের ভাষায় 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' বলা হয়।

সাত ঃ ইসলামী আন্দোলন সঠিক কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচী নিয়ে দীর্ঘ সংগ্রাম যুগ অতিক্রম করা সত্ত্বেও এবং ইসলাম কায়েমের যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মীদল সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত বিজয় যুগ নাও আসতে পারে। অবশ্যই ঈমানদার ও সৎকর্মশীল এক জামায়াত লোক তৈরী হলে ইসলামের বিজয়ের প্রথম শর্ত পূরণ হয়। কিন্তু যে সমাজে ইসলামী বিধান কায়েমের চেষ্টা চলে সে সমাজের বৃহত্তর জনসংখ্যা যদি আদর্শের সক্রিয় বিরোধী হয় তাহলে বিজয় সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর তৈরী যে নেতৃত্ব ও কর্মীদল মদীনায় ইসলাম কায়েম করতে সক্ষম হলেন তারা মক্কায় কেন অক্ষম হলেন ? মক্কার জনগণ সক্রিয়ভাবে ইসলাম বিরোধী ছিল বলেই সেখানে বিজয় আসেনি। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, ইসলাম বিরোধী জনতার উপর ইসলাম কায়েম করা যায় না। আল্লাহ পাক তাঁর দ্বীনের মহা নেয়ামত অনিচ্ছুক জনতার উপর চাপিয়ে দেন না।

আল্লার অনেক রাসূল এ কারণেই দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করতে পারেননি। এটা তাদের ব্যর্থতা নয়। তাদের চেয়ে যোগ্য কে হতে পারে? ইসলাম কায়েমের যোগ্য লোক তৈরী হওয়ার শর্তটি মক্কায় পূর্ণ হলেও জনগণের বিরোধী না হওয়ার শর্তটি সেখানে পূর্ণ হয়নি। এ দ্বিতীয় শর্তটি মদীনায় পূর্ণ হওয়ায় ইসলাম বিজয় লাভ করতে সক্ষম হয়।

একথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় যে, ইসলামী আন্দোলনের কাজ হলো প্রথম শর্ত পূরণের চেষ্টা করা–অর্থাৎ বাতিল শক্তির সাথে মুকাবিলা করে সমাজের মধ্য থেকে একদল বিপ্লবী মুজাহিদ তৈরী করা। যদি এ শর্ত পূরণ হয় এবং দ্বিতীয় শর্তও উপস্থিত থাকে তাহলে ঐ মুজাহিদ দলকে নেতৃত্ব দান করার দায়িত্ব আল্লাহ পাক নিজ হাতে

রেখেছেন। কিভাবে কী পন্থায় কখন তিনি ক্ষমতা দান করবেন তা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। ক্ষমতার আসনে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আল্লারই। কোন অস্বাভাবিক ও কুটিল পন্থায় নেতৃত্ব হাসিল করার চেষ্টা ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মপন্থা হতে পারে না।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল তাদেরকে দুনিয়ার খেলাফত দান করার ওয়াদা আল্লাহ্ করেছেন।”

–(সূরা আন নূর ঃ ৫৫)

উপরোক্ত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ না করে কোন না কোন প্রকারে ক্ষমতা হাসিল করলে যদি ইসলামকে কায়েম করার উদ্দেশ্য সফল হতো তাহলে রাসূল (সঃ)-কে মক্কার নেতারা ইসলামের দাওয়াত পরিত্যাগ করে বাদশাহী কবুল করার যখন আহ্বান জানালেন তখন তিনি ক্ষমতা হাতে নিয়ে কায়দা করে ইসলাম কায়েমের কথা নিশ্চয় বিবেচনা করতেন। একটি সমাজ ব্যবস্থাকে বদলিয়ে নতুন কোন ব্যবস্থা চালু করতে হলে ঐ সমাজ থেকেই নতুন আদর্শ কায়েমের উপযোগী একদল নিঃস্বার্থ লোককে তৈরী করতে হবে। আরও মজার ব্যাপার এই যে, এ ধরনের লোক অনৈসলামী সমাজে ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। কারণ পার্থিব কোন স্বার্থের টানে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসা অস্বাভাবিক। যারা কায়েমী স্বার্থের বাধা ও যুলুমকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে আসে, তারাই নতুন আদর্শের উপযোগী। সংগ্রাম যুগেই এ ধরনের লোক বাছাই করা সম্ভব। বিজয় যুগে সুবিধাবাদী লোকও আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। তখন নিঃস্বার্থ আদর্শবাহী বাছাই করা অত্যন্ত কঠিন। এজন্যই বিজয়ের পর আদর্শিক আন্দোলন ক্রমে ক্রমে স্বার্থপরদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইসলামী আন্দোলন ও ক্যাডার পদ্ধতি ঃ

যে কোন আদর্শ বাস্তবে কায়েম করতে হলে সে আদর্শের মন, মগয ও চরিত্র বিশিষ্ট নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী তৈরী করতেই হবে। এ উদ্দেশ্যে যে সংগঠন কায়েম করা হয় এর নেতৃত্ব যদি আদর্শগত গুণাবলী ও যোগ্যতা ছাড়া শুধু রাজনৈতিক প্রভাব ও আর্থিক যোগ্যতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

হয় তাহলে এ জাতীয় সংগঠন দ্বারা কিছুতেই ঐ আদর্শ কায়েম হতে পারে না। তাই আদর্শ ভিত্তিক আন্দোলন উপযুক্ত নেতা ও কর্মীদল তৈরী করার জন্য কোন না কোন ক্যাডার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য।

মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজে সব ছাত্রকে একই ক্লাসে ভর্তি করলে এবং একই মানের কাজ দিলে যেমন শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না, তেমনি সব ধরনের লোককে সংগঠনে একই মানে হিসেব করলে মন, মগয ও চরিত্র গঠনের লক্ষ্য হাসিল হতে পারে না। তাই প্রথমে সমর্থক, ক্রমে কর্মী ও সদস্যের দায়িত্ব গ্রহণ করার একটা স্বাভাবিক ক্রমিক পর্যায় প্রয়োজন। এ জাতীয় পদ্ধতিকেই ক্যাডার সিষ্টেম বলে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সংগঠনে ক্যাডার সিষ্টেম ছিল না বলে যারা মনে করেন তারা হিসেবে বিরাট ভুল করেন। রাসূলের প্রতি ঈমান আনার ফলে কায়েমী স্বার্থের পক্ষ থেকে যে চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হতো তার ফলে আপনিতেই ক্যাডার পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল। কে কে যুলুম-অত্যাচার সত্ত্বেও রাসূলকে ত্যাগ করতে রাযী হননি, আর কারা বিপদের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হতে সাহস পাচ্ছিলেন না তা সে সময় সহজেই বাছাই করা সম্ভব ছিল।

বর্তমানে মুসলিম সমাজে ইসলামী আন্দোলন যদ্দিন ঐ রকম কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন না হয় তদ্দিন কৃত্রিমভাবেই ক্যাডার সিষ্টেম চালু করতে হবে। কিন্তু আসল ক্যাডার পদ্ধতি তখন গড়ে উঠবে যখন বাতিল শক্তির সাথে বিরোধ প্রকট হয়ে উঠবে। ঐ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবার পূর্বে ইসলামী আন্দোলনে কে কি পরিমাণ সক্রিয় এবং জান-মাল কে কতটুকু কুরবানী দিতে পারে এর বিভিন্ন মান নির্ণয়ের জন্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই শ্রেণী বিন্যাস প্রয়োজন। কারণ বর্তমান মুসলিম সমাজে মুসলিম হবার দাবীদার সবাই। এর মধ্যে খুব পরহেযগার ব্যক্তিও হয়তো ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে মোটেই যোগ্য নন। একজন ভালো মুহাদ্দিসও হয়তো আন্দোলনের ময়দানে এগুতে রাযী নন। মসজিদের একজন যোগ্য ইমাম হয়েও বাতিলের বিরুদ্ধে ময়দানে নামতে রাযী না-ও হতে পারেন। এ ধরনের লোকদেরকে ইসলামী আন্দোলনের সংগঠনে সদস্য বলে স্বীকার করা দ্বারা ইকামাতে দ্বীনের

কাজ অগ্রসর হতে পারে না। এজন্যই ক্যাডার সিষ্টেম ছাড়া লোক তৈরীর উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না।

ক্যাডারের এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও হক ও বাতিলের চরম সংঘর্ষের সময় কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় লোকও দুর্বলতার পরিচয় দিয়ে পিছিয়ে পড়তে পারে, আবার অনগ্রসর কিছু লোকও অগ্রসর হয়ে আসতে পারে। তখন-ই ক্যাডার পদ্ধতিটি স্বাভাবিক মানে পৌঁছবে।

❏

হক ও বাতিলের সংঘর্ষ অনিবার্য কেন ?

দুনিয়ায় যত নবী ও রাসূল এসেছেন তাঁদের সবাই দ্বীনে হক কায়েম করার দায়িত্বই পালন করে গেছেন। যে দেশে দ্বীনে হক কায়েম ছিল না সেখানে অবশ্যই বাতিল কায়েম ছিল। হক কায়েমের চেষ্টা করলে বাতিলের পক্ষ থেকে বাধা আসাই স্বাভাবিক। কারণ হক ও বাতিল একই সাথে চালু থাকতে পারে না। আলো ও অন্ধকারের সহ অবস্থান অসম্ভব। তাই যখনই কোন নবী হকের দাওয়াত দিয়েছেন তখনই বাতিল বাধা দিয়েছে। একমাত্র আদম (আ) এবং সুলায়মান (আ) বাধার সম্মুখীন হননি। কারণ আদম (আ)-এর সময় কোন মানুষই ছিল না, বাধা দেবে কে ? আর সুলায়মান (আ) তাঁর পিতা দাউদ (আ)-এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালক ছিলেন বলে তাঁকে বাধা দেয়ার মতো কোন বাতিল শক্তি ছিলই না।

হকের আওয়ায যে কালেমায়ে তাইয়েবার মারফতে পয়লা ঘোষণা করা হয় তার মধ্যে আল্লাহকে ইলাহ স্বীকার করার পূর্বে লা-ইলাহা বলে সমস্ত বাতিলকে অস্বীকার করা হয়। সমাজে ইলাহ বা মনিব বা হুকুমকর্তার দাবীদার বাতিল শক্তি কায়েম আছে বলেই পয়লা বাতিলকে অস্বীকার করা দরকার হয়। বাতিলকে মন-মগযে কায়েম রেখে হককে স্বীকার করা অর্থহীন। তাই পয়লা লা-ইলাহা বলে সমস্ত বাতিল ইলাহকে অস্বীকার করে ইল্লাল্লাহ বলে একমাত্র আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ج

অর্থ ঃ "যে তাগুতকে অস্বীকার করলো এবং আল্লার প্রতি ঈমান আনল সে-ই মযবুত রজ্জু ধারণ করেছে।"–(সূরা বাকারা ঃ ২৫৬, আয়াতুল কুরসী)

তাগুত অর্থ হলো আল্লার বিদ্রোহী শক্তি। কাফের আল্লাহকে অস্বীকার করে মাত্র। কিন্তু তাগুত মানুষকে আল্লার দাসত্ব করতে বাধা দেয় এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার আনুগত্য করতে বাধ্য করে। ফিরাউন এমনি

ধরনের তাগুত ছিল বলেই মূসা (আ)-কে ফিরাউনের নিকট পাঠাবার সময় আল্লাহ বললেন—

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّه طَغٰى ـ (النزعات : ١٧)

"ফিরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয়ই সে বিদ্রোহ করেছে।"
–(সূরা আন নাযিয়াত ঃ ১৭)

ইসলাম বিরোধী শক্তি এক কথায় তাগুত। দ্বীনে বাতিল তাগুতী শক্তিরই নাম। কালেমায়ে তাইয়েবায় প্রথমেই তাগুত বা বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলা হয় যে, লা-ইলাহা বা কোন হুকুমকর্তাকে মানি না। অন্য সব কর্তাকে অস্বীকার করার পরই ইল্লাল্লাহ বলে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে স্বীকার করা যায়। সুতরাং ইসলামের প্রথম কথাই বাতিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এ কারণেই কালেমার দাওয়াত নিয়ে যে নবীই এসেছেন তাগুত বা বাতিল তাকে স্বাভাবিকভাবেই দুশমন মনে করে নিয়েছে।

আল্লাহ পাক যাদেরকে নবী ও রাসূল হিসেবে বাছাই করেছেন তারা সবাই নিজ নিজ দেশে সৎ, বিশ্বাসী, সত্যবাদী ও অন্যান্য যাবতীয় মানবিক গুণের কারণে জনপ্রিয় ছিলেন। দ্বীনে হকের দাওয়াত দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত শেষ নবীও আল-আমীন ও আস-সাদেক বলে প্রশংসিত ছিলেন। কিন্তু اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ "আল্লার দাসত্ব কর ও তাগুতকে ত্যাগ কর।"–(সূরা আন নাহল ঃ ৩৬) বলে দাওয়াত দেয়ার পর নবীর সাথে তাগুতের সংঘর্ষ না হয়েই পারে না।

নবীর দাওয়াত শুনেই নমরূদ, ফিরাউন ও আবু জেহেলরা বুঝতে পারল যে, তারা দেশকে যে আইনে শাসন করছে ও সমাজকে যে নীতিতে চালাচ্ছে, তা বদলিয়ে নবী নতুন কোন ব্যবস্থা চালু করতে চান। ফিরাউন স্পষ্ট বললো ঃ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ। "আমি আশংকা করি যে, (মূসা) তোমাদের দ্বীনকে বদলিয়ে দেবে।"–(সূরা মুমিন ঃ ২৬)

যারা দেশ শাসন করে তারা আইন-কানুন এমনভাবেই বানায় যাতে শাসক শ্রেণীর স্বার্থ ঠিক থাকে। জনগণকে শোষণ করে শাসক গোষ্ঠীর প্রাধান্য বজায় রাখার উপযোগী আইন ও অর্থব্যবস্থাই চালু রাখা হয়। মানব রচিত আইনের বৈশিষ্ট্যই এটা, সুতরাং প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র

ব্যবস্থা বহাল রাখাই শাসকদের স্বার্থ। এজন্যেই এদেরকে কায়েমী স্বার্থ বলা হয়। অর্থাৎ প্রচলিত ব্যবস্থা বহাল থাকলে যাদের স্বার্থ কায়েম থাকে তারাই কায়েমী স্বার্থ (Vested Interest)।

যখনই কোন নবী আল্লার দাসত্বের দাওয়াত দিয়েছেন তখনই এ কায়েমী স্বার্থ এটাকে তাদের স্বার্থের বিরোধী বলে বুঝতে পেরেছে। সে কারণেই তারা বাধা দেয়া যরুরী মনে করেছে। শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিই নয়, সামাজিক ও ধর্মীয় স্বার্থও নবীদেরকে সহ্য করেনি। ইবরাহীম (আ)-এর পিতা আযর ধর্মীয় নেতা ছিল। নমরূদের দরবারে তার রাজ-পুরোহিতের মর্যাদা ছিল। ধর্মের ব্যবসা নিয়ে নমরূদের অধীনে সুখেই ছিল। ইবরাহীম (আ)-এর দাওয়াতে আযরের ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগল। শেষ নবী আশা করেছিলেন যে, ইয়াহুদী ও নাসারাদের ওলামা ও পীরেরা (কুরআনের ভাষায় আহবার ও রুহবান) হয়তো তাঁর দাওয়াত সহজেই কবুল করবে। কারণ আল্লাহ, আখেরাত, নবী, ওহী ইত্যাদির সাথে তারা আগেই পরিচিত। কিন্তু দেখা গেল যে, রাসূল (সঃ)-এর সাথে যখন মক্কার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ও কায়েমী স্বার্থের সংঘর্ষ বাঁধল তখন ঐ আহবার ও রুহবানদের ধর্মীয় স্বার্থও তাদেরকে আবু জেহেলদের সাথেই সহযোগিতা করতে বাধ্য করল। এভাবেই হক ও বাতিলের সংঘর্ষ অবশ্যই অনিবার্য এবং হকের বিরুদ্ধে সকল প্রকার কায়েমী স্বার্থ একজোট হয়েই বিরোধিতা করে থাকে।

কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, মুসলিম প্রধান দেশে মুসলিম শাসকদের সাথে ইসলামী আন্দোলনের এ ধরনের বিরোধ হবার কারণ কী ? মুসলিম নামধারী হলেই সত্যিকার ইসলামপন্থী হয়ে যায় না। ইয়াযীদ মুসলিম শাসকই ছিল। কিন্তু ইসলামী আদর্শের ধারক ইমাম হুসাইন (রাঃ)-কে ইয়াযীদ সহ্য করতে পারেনি। এ দেশে মুসলিম নামধারী নাস্তিক, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, কমিউনিষ্ট ও সোসালিষ্ট বহু নেতা ও দল আছে যারা ইসলামী আন্দোলনের চরম দুশমন।

আসল ব্যাপার হলো কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা। যারা কোন দিক দিয়ে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সুবিধা ভোগ করছে তারা যখন বুঝতে পারে যে, ইসলামী আন্দোলন বিজয়ী হলে যে ধরনের আইন-কানুন ও সমাজ ব্যবস্থা চালু হবে তাতে তাদের বর্তমান প্রতিষ্ঠিত স্বার্থ নষ্ট হবে তখনই তারা এ আন্দোলনের শত্রু হয়ে যায়।

যে বাতিল শক্তি দ্বীনে হক কায়েমের পথে বাধা সৃষ্টি করে তা দু' ধরনের হয়ে থাকে। প্রধান বাতিল শক্তি হলো সরকারী ক্ষমতাসীন শক্তি। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যাদের হাতে থাকে তারা ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। অনৈসলামী সমাজে ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা দলের নেতৃত্বে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা যে চালু হতে পারে না সে কথা তারা ভালভাবেই জানে। ইসলামী রাষ্ট্রে তাদের নেতৃত্ব বহাল থাকার কোন সম্ভাবনাই নেই। তাই তাদের অস্তিত্বের স্বার্থেই তারা ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী।

সমাজে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী আরও এক ধরনের শক্তি রয়েছে যারা সরাসরি বাতিল শক্তির মধ্যে গণ্য না হলেও হক ও বাতিলের সংঘর্ষে তারা হকের পক্ষে সক্রিয় হন না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারা বাতিলের সাথেই সহযোগিতা করেন। বাতিলের বিরুদ্ধে ময়দানে যারা সক্রিয় নয় তারা ঐ সংঘর্ষে শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না। এমনকি দ্বীনের খাদেম হয়েও এ জাতীয় ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হন। ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করার হিম্মত যারা করেন না তারা এক পর্যায়ে বাতিলেরই সহায়ক প্রমাণিত হন।

❒

দ্বীনি খেদমতের সাথে এ সংঘর্ষ হয় না কেন ?

যে দেশে দ্বীনে হক কায়েম নেই সেখানে ইকামাতে দ্বীনের কাজ বা ইসলামী আন্দোলন চালালে কায়েমী স্বার্থ অবশ্যই বাধা দেবে। ইসলামী আন্দোলনকে দ্বীনে বাতিলের জন্য ক্ষতিকর ও আপত্তিকর মনে করাই স্বাভাবিক। যদি কায়েমী স্বার্থ কোন ইসলামী খেদমতকে বিপজ্জনক মনে না করে তাহলে বুঝতে হবে যে, ঐ খেদমত যতই মূল্যবান হোক তা ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন নয়।

মাদ্রাসাসমূহ নিসন্দেহে দ্বীনের বিরাট খেদমত। কিন্তু মাদ্রাসার যে দাওয়াত ও কর্মসূচী তা বাতিল সরকার ও সমাজ ব্যবস্থাকে উৎখাত করবে বলে কায়েমী স্বার্থ মনে করে না। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মাদ্রাসা ভারতের দেওবন্দে অবস্থিত। ভারত সরকার ঐ মাদ্রাসাকে সে দেশের আইন, শাসন ও সরকারের জন্য ক্ষতিকর মনে করে না। ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে দেওবন্দ মাদ্রাসার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এক বিরাট আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ঐ সম্মেলনে বক্তৃতা করেছেন। ইন্দিরা সরকার দেওবন্দ মাদ্রাসার দাওয়াত ও কর্মসূচীকে সে দেশের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য কোন প্রকার ক্ষতিকারক মনে করেননি।

দ্বীনের বিরাট খেদমত হিসেবে দেওবন্দ মাদ্রাসাসহ আমাদের দেশের ছোট বড় সব মাদ্রাসার নিকটই মুসলিম জাতি কৃতজ্ঞ। এ খেদমতের গুরুত্ব কোন মুসলিমই অস্বীকার করতে পারে না। এসব মাদ্রাসা নিশ্চয়ই ইসলামী আন্দোলনের সহায়ক। আন্দোলনের যোগ্য বহু আলেম এসব মাদ্রাসা থেকে এসেছেন। কিন্তু মাদ্রাসাগুলো নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন চালাচ্ছে না।

তেমনিভাবে তাবলীগ জামায়াত দ্বীনের এক মহান খেদমতের আঞ্জাম দিচ্ছে। এ জামায়াত সারা দুনিয়ায়ই বিপুল সংখ্যক লোককে আল্লাহ, রাসূল ও আখেরাতমুখী বানাচ্ছে। এ জামায়াতের কেন্দ্র ভারতের দিল্লীতে অবস্থিত। এ বিশ্ব জামায়াতের আমীরও ভারতের নাগরিক। কিন্তু এ জামায়াতকে কোন দেশের সরকারই তাদের জন্য ক্ষতিকর মনে করে না। এমন কি চীন ও রাশিয়াতে পর্যন্ত এ জামায়াতকে যেতে বাধা

দেয়নি। এ মহান জামায়াতের উসিলায় কমিউনিষ্ট দেশেও কালেমা-নামাযের পয়গাম এবং আল্লাহ, রাসূল ও আখেরাতের দাওয়াত পৌঁছতে পারছে—এটা খুবই আনন্দের কথা। এটাকে ছোট খেদমত মনে করা অন্যায়।

কিন্তু তাবলীগের দ্বারা যত বড় দ্বীনি খেদমতই হোক এ জামায়াতের দাওয়াত ও কর্মসূচীতেই ইকামাতে দ্বীনের কোন পরিকল্পনা নেই। মুসলিম সংখ্যালঘু দেশ—এমন কি কমিউনিষ্ট দেশেও এ জামায়াতকে কাজ করতে হচ্ছে। সুতরাং বাতিলের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে দ্বীনের খেদমত করার যতটুকু সুযোগ নেয়া সম্ভব ততটুকুই এ জামায়াত নিচ্ছে।

সাড়ে চার বছর মনপ্রাণ লাগিয়ে এ জামায়াতে কাজ করার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। এম. এ. পরীক্ষা দিয়েই তিন চিল্লায় (চার মাস) একটানা এ জামায়াতের সাথে থাকা কালেই নিজের জীবনকে ইসলামের জন্য উৎসর্গ করার জযবা ও প্রেরণা বোধ করি। সুতরাং আমার জীবনে তাবলীগ জামায়াতের বিরাট অবদানকে কোন দিনই ভুলব না। এ কারণেই তাবলীগ জামায়াতের সাথে আমার মহব্বত স্বাভাবিকভাবেই গভীর ও স্থায়ী।

বাংলাদেশের তাবলীগ জামায়াতের নেতৃস্থানীয় সবাইকে আমি অন্তর থেকে মহব্বত করি। কারণ এক সাথে কয়েক বছর এক জামায়াতে কাজ করার দরুন ব্যক্তিগতভাবে তাদের ইখলাস ও একাগ্রতা সম্পর্কে আমার সঠিক ধারণা হবার সুযোগ হয়েছে। তাদের কাউকে আমি অন্তরে উস্তাদ হিসেবে শ্রদ্ধা করি—যেমন হযরত মাওলানা আবদুল আযীয, সাবেক আমীর, তাবলীগ জামায়াত, বাংলাদেশ।* কেউ আমার শ্রদ্ধাভাজন দ্বীনি মুরুব্বী যার কাছ থেকে ইসলামের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করার প্রেরণা পেয়েছি—যেমন ইঞ্জিনিয়ার আবদুল মুকীত ভাই।* নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে বেশ কয়েকজন আছেন যাদেরকে ঘনিষ্ট সহকর্মী ও মহব্বতের বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলাম।

আমার ঐসব উস্তাদ, মুরুব্বী ও বন্ধুদের খেদমতে অত্যন্ত দরদের সাথে আকুল আবেদন জানাই যাতে তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত এ মহান

* বর্তমানে বেঁচে নেই।

* বর্তমানে বেঁচে নেই।

জামায়াত সম্পর্কে এ দেশের মুসলমানদের মধ্যে কেউ কোন ভুল ধারণার সৃষ্টি করতে না পারে। কেউ কেউ তাবলীগ জামায়াতের কাজকে হুবহু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন বলে প্রচার করে থাকেন। বর্তমান কালের মাদ্রাসাগুলোতে কুরআন ও হাদীসেরই শিক্ষা হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে কেউ যদি মনে করে যে, রাসূল (সঃ) এ ধরনের মাদ্রাসাই কায়েম করেছিলেন তাহলে এটা ভুল হবে। ঠিক তেমনি তাবলীগ জামায়াতের কাজ দ্বারা দ্বীনের বড় খেদমত হওয়া সত্ত্বেও এ ধারণা সৃষ্টি হতে দেয়া উচিত নয় যে, ঠিক এতটুকু কর্মসূচী নিয়েই রাসূল (সঃ) ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার যে কঠিন ও সংগ্রামপূর্ণ আন্দোলন আল্লার রাসূল (সঃ) পরিচালনা করেছিলেন এবং যে কর্মসূচী নিয়ে তিনি বাস্তবে দ্বীনকে কায়েম করে গেছেন ঠিক সে আন্দোলনের কর্মসূচীই যদি তাবলীগ জামায়াত গ্রহণ করতো তাহলে বিনা বাধায় এবং বাতিলের সাথে কোন সংঘর্ষ ছাড়া এভাবে সব দেশে কাজ করার সুযোগ পেতো না। দুনিয়াময় দ্বীনের বুনিয়াদী শিক্ষাকে পৌঁছাবার প্রাথমিক কর্তব্য পালনের যে কর্মসূচী এ জামায়াত গ্রহণ করেছে তাতে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে হলে বর্তমান কর্মসূচীই সঠিক। কিন্তু আল্লার দ্বীনকে দুনিয়ায় বিজয়ী ও কায়েম করার জন্য এটুকু কর্মসূচী যে কোনক্রমেই যথেষ্ট নয় সে কথা সবারই বুঝতে হবে। যদি এটুকু দাওয়াত ও কর্মসূচীকেই রাসূল (সঃ)-এর আন্দোলন বলে ধারণা সৃষ্টি হয় তাহলে এ জামায়াত দ্বারা দ্বীনের যে পরিমাণ খেদমত হচ্ছে তার চেয়ে বেশী পরিমাণে দ্বীনের ক্ষতির আশংকা রয়েছে। যাদের মধ্যে এ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তাদের আচরণ থেকেই এ ক্ষতির ধরন ও পরিমাণ সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

যারা তাবলীগ জামায়াতের ছয় উসূল বিশিষ্ট কর্মসূচী ও এ জামায়াতের কর্মপদ্ধতিকে (তারীকে কার) রাসূল (সঃ)-এর মক্কী জীবনের দ্বীনি দাওয়াতের অনুরূপ বলে মনে করেন এবং এটুকু কাজের মাধ্যমে আল্লার যমীনে আল্লার দ্বীন কায়েম হয়ে যাবে বলে আশা করেন তাদের মধ্যে কয়েকটি ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক ঃ

এক ঃ প্রথমত তারা ইসলামকে শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ মনে করবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্যই ইসলাম যে বিধান দিয়েছে তার

কোন প্রয়োজনই মনে করবে না। ইসলামের অর্থনীতি, আইন ও রাজনীতি তাদের নিকট অপ্রয়োজনীয়ই মনে হবে।

দুই ঃ ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী সরকার কায়েমের আন্দোলনকে তারা দুনিয়াদারী কাজ মনে করবে এবং যারা এ কাজ করে তাদেরকে ক্ষমতার লোভী বলেই ধারণা করবে।

তিন ঃ বাতিলের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে দ্বীন কায়েমের ধারণা তাদের মধ্যে এমন মনোভাব সৃষ্টি করবে যে, বাতিল ইসলামের যতটুকুতে আপত্তি করে না ততটুকু ইসলাম নিয়েই তারা সন্তুষ্ট থাকবে।

চার ঃ এ ধারণার ফলে দ্বীনের আর যত প্রকার খেদমত আছে সে সবকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। শুধু তাবলীগই দ্বীনের কাজ বলে মনে হবে এবং অন্যান্য দ্বীনি খেদমতের মূল্য বুঝবার যোগ্যতাই তাদের থাকবে না।

পাঁচ ঃ নির্বাচনের সময় এ জাতীয় লোকেরা ইসলাম বিরোধী লোককে ভোট দিতেও আপত্তি করবে না। বরং ইসলামের আইন চালু করার দাবীতে যারা রাজনীতি করে তাদেরকে তারা অপসন্দ করবে। ইসলামের নামে রাজনীতি করাকে তারা দূষণীয় মনে করার কারণে ভোটের বেলায় তারা ঐসব লোককেই ভোট দেবে যারা ইসলামের কথা বলেই না।

ছয় ঃ তাদের এ ধারণাও হতে পারে যে, তাবলীগ জামায়াত এমন সুন্দর কায়দায় দ্বীন ইসলামকে কায়েম করার চেষ্টা করছে যে, ইসলামের দুশমনরা টেরই পাচ্ছে না। এমন চমৎকার হিকমতের সাথে কাজ করা হচ্ছে যে, ইসলাম বিরোধীরা বাধা দেয়ার কোন উপায়ই তালাশ করে পাচ্ছে না।

এ রকম ধারণা হলে তা কতো মারাত্মক ! আল্লাহ্ পাক কি নবীদেরকে এমন হিকমত শেখাতে পারলেন না, যাতে তারা তাবলীগের মতো বিনা বাধায় কাজ করতে পারতেন ? নবীগণ কি তাহলে এত যুলুম অত্যাচার অনর্থকই সহ্য করলেন ?

কেউ বলতে পারে যে, নবীরা কাফেরদের মধ্যে দাওয়াত দিচ্ছিলেন বলেই বাধা পেয়েছেন। আর তাবলীগ মুসলমানদের মধ্যেই কাজ করছে বলে বাধা নেই। মুসলমানদেরকে ব্যক্তিগতভাবে ভালো মুসলমান বানাবার

চেষ্টা করলে বাতিল থেকে বাধা আসবে কেন ? কিন্তু দেশের আইন, শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের দাওয়াত ও কর্মসূচী নিয়ে কাজ করলে মুসলিম নামধারী শাসক শক্তি অমুসলিমদের মতোই বাধা দেবে।

এসব আশংকার কারণেই তাবলীগ জামায়াতের দায়িত্বশীলদের খেদমতে এত কথা আরয করতে বাধ্য হলাম। তাবলীগ জামায়াত ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন নয়। এ জামায়াত দ্বীনের মহা মূল্যবান খেদমতের এক বিশ্বজোড়া আন্দোলন। তাবলীগ সম্পর্কে এ ধারণাই আমি সঠিক বলে মনে করি। তাবলীগের দাওয়াত ও কর্মসূচীকে রাসূল (সঃ)-এর ইসলামী আন্দোলনের মতোই পূর্ণাঙ্গ বলে ধারণা হওয়াটা ইসলামী জীবন-বিধানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হবে। এর ফলে বিশ্ব নবীকে মাত্র একজন ধর্মীয় নেতা হিসেবে মনে করা হবে। আল্লাহ পাক এ জাতীয় ভুল ধারণা থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করুন।

প্রতি বছর তাবলীগের যে বিরাট বিশ্ব এজতেমা টংগীর বিস্তীর্ণ এক ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় তাতে বিভিন্ন সময় ১৫ থেকে ২৫ লাখ লোকের সমাগম হয়। এটা সত্যিই উৎসাহের ব্যাপার। আমিও এতে শরীক হই এবং মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের প্রতি মহব্বতের এ দৃশ্য দেখে চোখ জুড়াই।

দ্বীনে বাতিলকে উৎখাত করে দ্বীনে হককে কায়েম করার দাওয়াত ও কর্মসূচী নিয়ে যদি এর দশ ভাগের এক ভাগ লোকও একত্র হয় তাহলে এ দেশের সরকার ও কায়েমী স্বার্থ অস্থির হয়ে যেতো। ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রী মহল পত্র-পত্রিকায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক হৈ চৈ শুরু করতো।

১৯৮১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকায় একটি ইসলামী ছাত্র সংগঠনের মাত্র ১৫/২০ হাজার কর্মীর সম্মেলন ও মিছিল সমস্ত ইসলাম বিরোধী মহলে অদ্ভূত কম্পন সৃষ্টি করেছে। অথচ ঐ সংগঠনটি কোন রাজনৈতিক দল নয়। তারা ইকামাতে দ্বীনের কথা বলে এবং ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের জন্য ছাত্র সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে বলেই কায়েমী স্বার্থ ও বাতিল শক্তিগুলো এত বিচলিত।

সকল বাতিল শক্তি ও ইসলাম বিরোধী মহল ভালো করেই জানে যে, তাবলীগ নিছক ও নির্ভেজাল একটি ধর্মীয় জামায়াত এবং রাজনীতি,

রাষ্ট্র ও সরকার নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। সুতরাং তাদের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার কোন কারণ নেই এবং ঘাবড়াবারও কোন হেতু নেই।

ঠিক একই কারণে পীর সাহেবানদের ওরস ও মাহফিলের লক্ষ লক্ষ মুসলমানের সমাবেশকে বাতিল শক্তি ভয় পায় না। এসব মাহফিলে ওয়ায, তালকীন ও যিকর-এর মারফতে ইসলামের খেদমত নিশ্চয়ই হচ্ছে। কিন্তু সেখানে ইকামাতে দ্বীনের কোন কর্মসূচী না থাকায় ইসলাম বিরোধী মহল চিন্তিত নয়।

একথাটা পরিষ্কার করার জন্যই উদাহরণস্বরূপ মাদ্রাসা, তাবলীগ ও খানকার উল্লেখ করলাম। খেদমতে দ্বীনের সাথে বাতিল শক্তির সংঘর্ষ হয় না। একমাত্র ইকামাতে দ্বীনের দাওয়াত ও প্রোগ্রামের সংগেই এ সংঘর্ষ বাধে। সব নবীর জীবনেই একথা সত্য বলে দেখা গিয়েছে।

কুরআন মজীদে যত নবী ও রাসূলের কথা আলোচনা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, সমকালীন ক্ষমতাসীন শক্তি ও ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থ কোন নবীকেই বরদাশত করতে পারেনি। শুধু হযরত আদম (আঃ) ও হযরত সুলায়মান (আঃ) ছাড়া আর সব নবীর সাথেই বাতিল শক্তির সংঘর্ষ হয়েছে। ইকামাতে দ্বীনের কর্মসূচী নিয়ে কাজ করায় যদি নবীদেরকেই বাতিলের সাথে সংঘর্ষ করতে হয়ে থাকে তাহলে নবীর উম্মাতের পক্ষে এ সংঘর্ষ এড়িয়ে ইসলামকে কায়েম করা কী করে সম্ভব হতে পারে ?

যারা বাতিলের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলাকে হিকমাত মনে করেন তাদের চিন্তা করা উচিত যে, আল্লাহ পাক নবী ও রাসূলগণকে ঐ হিকমাতটা কেন শেখালেন না ? আল্লার দ্বীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে যারা কাজ করতে চান তারা এ সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার কথা ভাবতেই পারেন না। তারা দ্বীনের কোন না কোন দিকের খেদমত অবশ্যই করতে পারেন এবং তাদের সেই খেদমত ইকামাতে দ্বীনের সহায়কও হতে পারে। কিন্তু তাদের ঐ কাজটুকু প্রত্যক্ষভাবে ইকামাতে দ্বীনের কাজ হতে পারে না। তাদের ঐটুকু খেদমত দ্বারা দ্বীন কায়েম হয়ে যাবে না। দ্বীন কায়েমের জন্য আলাদা কর্মসূচী অবশ্যই দরকার।

○

ওলামায়ে কেরাম সবাই "ইকামাতে দ্বীনে" সক্রিয় নন কেন ?

একথা সত্য যে, বাংলাদেশে কয়েক লক্ষ ওলামায়ে কেরাম আছেন। তারা বিভিন্ন প্রকার দ্বীনি খেদমতে নিযুক্ত রয়েছেন। ইকামাতে দ্বীনের দাবী অনুযায়ী তারা ইসলামী আন্দোলনে সবাই সক্রিয় হচ্ছেন না কেন–এ প্রশ্ন অবান্তর নয়। দীর্ঘকাল আলেম সমাজের গভীর সংস্পর্শে থেকে আমি এ প্রশ্নের জবাব তালাশ করেছি। আল্লাহ্ পাকই সঠিক কারণ জানেন। কিন্তু এ প্রশ্ন এত প্রাসংগিক যে, এর উত্তর না পেলে মুসলিম জনগণের পক্ষে ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। আমার সামান্য পর্যবেক্ষণের ফলাফল এখানে প্রকাশ করতে চাই ঃ

এক ঃ আমাদের দেশের মাদ্রাসাগুলো জনগণের চাঁদায় চলে। যেসব মাদ্রাসা সরকারী সাহায্য পায় তাও অতি সামান্য। মাদ্রাসার গরীব শিক্ষকগণকে মাদ্রাসার আর্থিক সমস্যার সমাধানেও সময় এবং শ্রম দিতে হয়। যারা মাদ্রাসায় পড়তে আসে তারা প্রায় সবাই গরীবের সন্তান। বিনা খরচে বা সামান্য খরচে স্কুল কলেজে পড়ান সম্ভব নয় বলে গরীবদের জন্য মাদ্রাসাই একমাত্র সম্বল। ছাত্রদের বই-কিতাব মাদ্রাসাই যোগাড় করে। এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্রদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা মাদ্রাসার পক্ষ থেকেই করতে হয়।

মুসলিম শাসনামলে শিক্ষার খরচ রাষ্ট্রই বহন করতো। বর্তমানেও সাধারণ শিক্ষার (স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের) ব্যয় ভারের প্রধান অংশ সরকারই বহন করে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা এর ব্যতিক্রম। জনগণের চাঁদার ভিত্তিতে মাদ্রাসাগুলো যে বেঁচে আছে সেটাই আল্লার বড় মেহেরবানী। এ অবস্থায় কুরআন হাদীসের যেটুকু হেফাযত মাদ্রাসার দ্বারা হচ্ছে এর শুকরিয়া আদায় করাও অসম্ভব। তাই মাদ্রাসায় শিক্ষার মান এমন উন্নত হওয়া সম্ভব নয় যেমন হওয়া উচিত। ফলে উন্নত মানের আলেম কমই হচ্ছে।

দুই ঃ মাদ্রাসা শিক্ষা দ্বারা দুনিয়ার উন্নতির কোন আশা নেই বলে ধনী লোকেরা তো মাদ্রাসায় ছেলেদেরকে পাঠায়ই না। গরীবদেরও মেধাবী ছেলেদেরকে বেশীর ভাগ স্কুল কলেজে পাঠায়। ফলে তুলনামূলকভাবে ভালো ছাত্র মাদ্রাসায় কমই আসে। যারা আসে তারাও মাদ্রাসা পাশ করে বা শেষ না করেই দুনিয়ার চাপে কলেজমুখী হয়ে পড়ে।

তিন ঃ বর্তমান পরিবেশে যারাই মাদ্রাসায় পড়ে তারা ইসলামের মহব্বতেই পড়ে। দুনিয়ায় তারা যে বড় কিছু করার সুযোগ পাবে না সে কথা তারা জানে। মসজিদের ইমাম, মাদ্রাসার শিক্ষক, বড়জোর স্কুলের আরবী ও দ্বীনিয়াত শিক্ষক, কি নিকাহ-র কাযী ইত্যাদি সুযোগ ছাড়া বড় কিছু করা তাদের ভাগ্যে জুটবে না বলে তারা ধরেই নেয়।

এ মানসিক অবস্থা নিয়ে যারা মাদ্রাসায় পড়তে বাধ্য হয় তারা শুধু আখেরাতের আশাই করে। মসজিদের ইমাম ও মাদ্রাসার মুদাররিস হিসেবে দ্বীনের খেদমত করার সৌভাগ্যকে তারা যথেষ্ট মনে করতে বাধ্য হয়। তা ছাড়া মাদ্রাসার পরিবেশ ও জীবনের ভবিষ্যত সম্ভাবনা ছাত্রদের মধ্যে দেশ ও জাতির জন্য বড় কিছু করার সংকল্পও সৃষ্টি করে না।

মাদ্রাসা পাশ করার পর গরীব আলেমদের রুযী-রোযগার সমস্যা বড় হয়ে দেখা দেয়। খুব কম আলেমই এমন আছেন যারা নিজ নিজ দ্বীনি পেশার (ইমামতি বা শিক্ষকতা) দায়িত্ব পালন করে ইসলামী আন্দোলনের জন্য যথেষ্ট সময় ও শ্রম দিতে পারেন এবং সংগঠনের বড় দায়িত্ব নিতে পারেন।

চার ঃ আর একটা এমন বড় কারণ রয়েছে যার ফলে ইসলামী আন্দোলন অনেক আলেমের নিকট সঠিক গুরুত্ব পাচ্ছে না।

মাদ্রাসা শিক্ষায় ইসলামকে একটি বিপ্লবী আন্দোলন হিসেবে শেখাবার ব্যবস্থা নেই। শুধু ধর্মীয় শিক্ষা হিসেবেই ইসলামকে শেখান হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) মানব সমাজকে কিভাবে পরিবর্তন করলেন, কুরআন কিভাবে ২৩ বছর রাসূল (সঃ)-এর আন্দোলনকে পরিচালিত করেছে, সেই কুরআন ও রাসূলের জীবন (হাদীস) থেকে বর্তমান যুগে ইসলামকে কায়েম করার জন্য কী করা দরকার, এসব দৃষ্টিভংগীতে মাদ্রাসায় এখন পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা চালু হয়নি। ফলে তারা ইসলামকে একটা ধর্ম

হিসেবেই জানতে পারছে মাত্র। মাদ্রাসা শিক্ষার মারফতে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে না। ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ববোধও সে কারণেই সৃষ্টি হচ্ছে না।

মাদ্রাসার উস্তাদগণ ইসলামের যে পরিমাণ শিক্ষা দিচ্ছেন তার চেয়ে বেশী ছাত্ররা কী করে শিখবে ? কিন্তু মাদ্রাসার যে মেধাবী ছাত্ররা দেশের ইসলামী আন্দোলনকে বুঝতে পারছে তা মাদ্রাসার বাইরের শিক্ষা। অবশ্য মাদ্রাসার ছাত্ররা যেহেতু মাদ্রাসায় কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান পায় সেহেতু আন্দোলনকে দৃষ্টিভংগী পেলে তারা আধুনিক শিক্ষিতদের তুলনায় অনেক দ্রুত আন্দোলনমুখী হয়ে পড়ে। ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে মাদ্রাসায় যদি শিক্ষা দেয়া হতো তাহলে আলেম সমাজ জাতীয় ব্যাপারে সর্বস্তরে ইসলামী নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হতেন।

পাঁচ ঃ সম্ভবত সবচেয়ে বড় কারণ রাসূল (সঃ)-কে শ্রেষ্ঠতম আদর্শ মানা সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব। ইকামাতে দ্বীনকে তো প্রকৃতপক্ষে আলেম সমাজের জীবনের আসল কর্মসূচী মনে করা উচিত। কিন্তু কেন এটা হয়নি ? আমার ধারণায় এর মূল কারণ আল্লার রাসূল (সঃ)-কে উসওয়াতুন হাসানা হিসেবে বাস্তবে মানার অভাব। এ অভাবেরও কারণ আছে। মুসলিম সমাজে একটা বড় রোগ দেখা দিয়েছে। যাকে কোন দিক দিয়ে দ্বীনের বড় খাদেম হিসেবে শ্রদ্ধা করা হয় তাকেই প্রায় উসওয়াতুন হাসানা বা শ্রেষ্ঠ আদর্শের মর্যাদা দেয়া হয়। বুযর্গ বলে মানলেই যেন তিনি রাসূলের স্থলাভিষিক্ত বা অন্তত কাছাকাছি বলে মনে করা হয়। তাই ইসলামের আদর্শ হিসেবে কোন আলেম বা পীরকে শ্রদ্ধা করতে গেলেই তাকে রাসূলের স্থলাভিষিক্ত মনে করতে শুরু করে।

একটি উদাহরণ দিলেই কথাটা সহজভাবে বুঝা যাবে। উপমহাদেশের যে কঠিন সময় হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুভী (রঃ) দেওবন্দে ইসলামী শিক্ষার আন্দোলন করেন, তখনকার তাঁর এ খেদমত নিশ্চয়ই অত্যন্ত মূল্যবান। তাঁর প্রতি গোটা মুসলিম জাতি কৃতজ্ঞ। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করাও স্বাভাবিক। কিন্তু কেউ যদি মনে করে যে, তিনি যে খেদমত করেছেন এর চেয়ে বড় দ্বীনি খেদমত আর হতে পারে না। সুতরাং তারই অনুকরণে একটি মাদ্রাসা কায়েম করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য—তাহলে এ ব্যক্তি হযরত নানুতুভী (রঃ)-কে উসওয়াতুন

হাসানার মর্যাদা দিল বলে বুঝা যায়। আল্লার রাসূল কি একটি মাদ্রাসা কায়েমের জন্য দুনিয়ায় এসেছিলেন ? তিনি যে আল্লার পূর্ণ দ্বীনকে সমাজে বিজয়ী করার কাজ করে গেলেন সে কাজটাকে কেন জীবনের উদ্দেশ্য মনে করা হয় না ? যদি রাসূল (সঃ)-কে জীবনের সব ব্যাপারে শ্রেষ্ঠতম আদর্শ মনে করা হতো তাহলে দ্বীনের আর সব খাদেমগণের খেদমতকে রাসূলের ব্যাপক খেদমতের একটা অংশ মাত্র মনে করা হতো।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে নিয়ে দ্বীনের জন্য যা কিছু করে গেছেন তার সবটুকু আমাদের অবশ্য করণীয় কর্তব্য বলে মনে হয় না কেন ? হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) যতটুকু করেছেন সেটা রাসূলের কাজের সবটুকু নয়। তাঁকে যদি আদর্শের মাপকাঠি মনে করা হয় তাহলে রাসূল আর মাপকাঠি থাকলেন কি করে ? আদর্শের যে মান রাসূল (সঃ) দেখিয়ে গেছেন সেটাই একমাত্র ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা মান। যে সে মানের যতটুকুতে পৌঁছতে পারে তাকে সে মানেই শ্রদ্ধা করতে হবে। কিন্তু রাসূলের মানে যে কেউ পৌঁছতে পারবে না এবং আর কাউকে যে রাসূলের সমান মানে শ্রদ্ধার আসন দেয়া যাবে না সে কথা সবার মনে পরিষ্কার থাকতে হবে।

দ্বীনের মাপকাঠি একমাত্র রাসূল ঃ

আল্লাহ পাক একমাত্র রাসূল (সঃ)-কে উসওয়াতুন হাসানা বা দ্বীনের মাপকাঠি বানিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলের সবচেয়ে বেশী অনুসরণ করেছেন বলেই রাসূলের আনুগত্যের (اطَاعَةُ رَسُوْلْ) ব্যাপারে তাঁরা শ্রেষ্ঠ আদর্শ। কিন্তু রাসূল যেমন নিজেই আদর্শ সাহাবায়ে কেরাম সে হিসেবে রাসূলের সমান মর্যাদার অধিকারী নন। এমনকি সব সাহাবীও এক মানের নন। চার খলীফার সবাইও এক মানের নন। তাই দ্বীনের একমাত্র মাপকাঠি (مِعْيَار) রাসূল এবং সবাইকে একমাত্র রাসূলকেই অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে।

আমরা সাহাবায়ে কেরামকে কী জন্য মানি ? তাঁদেরকে মানার জন্য নয়—বরং রাসূল (সঃ)-কে মানার উদ্দেশ্যেই তাঁদেরকে মানি। রাসূল (সঃ)-কে অনুসরণ করার ব্যাপারে তারাই আদর্শ স্থাপন করেছেন। তাই রাসূলকে মানার জন্যই সাহাবায়ে কেরামকে মানতে হবে। কারণ اتِبَاع

رسول বা রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণের দিক দিয়ে সাহাবায়ে কেরামই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। কিন্তু রাসূল (সঃ) যে অর্থে আদর্শ বা উসওয়া সে অর্থে সাহাবায়ে কেরাম উসওয়া নন। রাসূল (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা এক হতে পারে না—একথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তুলনা করার জন্য একটা সহজ উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। স্বর্ণ খাঁটি কি অখাঁটি এবং অখাঁটি হলে কী পরিমাণ অখাঁটি তা বুঝবার জন্য এক প্রকার পাথরে ঘষে জানা যায়। ঐ পাথরকে কষ্টি পাথর বলে। কষ্টি পাথর হলো মানদণ্ড বা মাপকাঠি যাকে আরবীতে বলে معيار—কষ্টি পাথরে ঘষে যদি স্বর্ণের কোন টুকরাকে একেবারে খাঁটি সোনা বলেও জানা যায় তবুও ঐ টুকরাকে কষ্টি পাথর বলা যাবে না। স্বর্ণ কষ্টি পাথর হতে পারে না। ঠিক তেমনি আল্লার রাসূলই একমাত্র কষ্টি পাথর। সে কষ্টি পাথরে যাচাই করেই সাহাবাগণকে খাঁটি স্বর্ণ বলে জানা যায়, কিন্তু তাই বলে তাঁরা নিজেরা কষ্টি পাথর নন।

সাহাবায়ে কেরামের জামায়াত সামগ্রিকভাবে খাঁটি হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তি হিসেবে সবাই আবার সমান মর্যাদার নন। খোলাফায়ে রাশেদার মর্যাদা আর সব সাহাবা থেকে বেশী। আবার হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মর্যাদা বাকী তিন খলীফার চেয়ে বেশী। মর্যাদার এ বেশকমের হিসেব কিভাবে করা হয়েছে? একথা সবাইকে স্বীকার করতে হবে, এ হিসাবের মাপকাঠি একমাত্র রাসূল (সঃ)। হযরত উমর (রাঃ)-এর চেয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করার মানদণ্ড বা মাপকাঠি একমাত্র রাসূল। রাসূলের কষ্টি পাথরে যাচাই করেই এ হিসেব বের করা হয়েছে।

আর একটি তুলনা দ্বারা এ পার্থক্যটা আরও পরিষ্কার হয়। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে খোলাফায়ে রাশেদার মধ্যে গণ্য করা হয় না কেন? হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (রাঃ)-কে দ্বিতীয় উমর আখ্যা দিয়ে খোলাফায়ে রাশেদার নিকটতম মর্যাদা দেয়া হয় কিভাবে? অথচ তিনি সাহাবী ছিলেন না। কোন্ মাপকাঠিতে বিচার করে এ দু'জনের ব্যাপারে এ তারতম্য করা হলো? নিসন্দেহে বলা যায় যে, রাসূলের মাপকাঠিতে বিচার করেই উম্মাত এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।

এসব যুক্তি একথা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লার রাসূল (সঃ)-ই একমাত্র আদর্শ মাপকাঠি এবং একমাত্র কষ্টি পাথর। এ কষ্টি পাথরে বিচার করেই মানুষের মধ্যে কে কতটুকু মর্যাদা পেতে পারে তা নির্ণয় করা হয়। যদি রাসূল ছাড়া আরও কোন মানুষকে কষ্টি পাথর মনে করা হয় এবং মাপকাঠি বলে ধারণা করা হয় তাহলে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই রাসূলের চেয়ে নিম্নমানেরই হবে। আল্লাহ পাক রাসূল ছাড়া আর কোন নিম্নমানের লোককে উসওয়া বা আদর্শ মেনে নিতে বলেননি।

দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, রাসূল (সঃ)-কে আল্লাহ পাক যে উসওয়ায়ে হাসানা হিসেবে একক মর্যাদা দিয়েছেন সে মর্যাদা অন্য কারো নীতিগতভাবে স্বীকার না করলেও বাস্তবে বড় দ্বীনি ব্যক্তিত্বকে এমন মর্যাদা দিয়ে ফেলা হয় যা একমাত্র রাসূলেরই প্রাপ্য।

রাসূলকে ওহী দ্বারা পরিচালিত করা হয় বলে তিনি যেমন নির্ভুল, অন্য কোন ব্যক্তি এমন নির্ভুল হতে পারে না। রাসূলকে যেমন অন্ধভাবে মেনে নিতে হয় তেমনভাবেও আর কাউকে মানা চলে না। যুক্তি বুঝে আসুক বা না আসুক রাসূলের নির্দেশ মেনে নেয়া যেমন ঈমানের দাবী, আর কারো নির্দেশের সে মর্যাদা হতে পারে না। রাসূল (সঃ) যেমন সমালোচনার ঊর্ধে আর কেউ তেমন নয়। বিনা যুক্তিতে রাসূলকে মানার জন্য আল্লাহ যেমন নির্দেশ দিয়েছেন অন্য কারো বেলায় তেমন কোন নির্দেশ দেননি।

কোন দ্বীনি ব্যক্তিত্ব যত বিরাট হোক, যদি তাঁকে নির্ভুল বলে বিশ্বাস করা হয়, তাঁকে অন্ধভাবে মানা হয়, তাঁকে সমালোচনার ঊর্ধে মনে করা হয়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে তাঁকে রাসূলের সমান মর্যাদা দেয়া হলো। অথচ মর্যাদার দিক দিয়ে কেউ রাসূলের সমান হতে পারে না।

দ্বীন ইসলামের মূল ভিত্তিই হলো তৌহিদ ও রিসালাত। আল্লার যাত ও সিফাতের দিক দিয়ে আর কেউ আল্লার সাথে তুলনীয় নয়। তেমনি ওহী দ্বারা পরিচালিত হওয়ার দরুন রাসূল যেরূপ নির্ভুল তেমন আর কেউ হতে পারে না। এজন্যই রাসূলকে যেমন অন্ধভাবে মানতে হয় তেমন আর কাউকে মানা চলে না। অর্থাৎ উসওয়াতুন হাসানা হিসেবে রাসূল একক। আর কেউ এ পজিশন পেতে পারে না। কালেমায়ে তাইয়েবার মাধ্যমে এ অর্থেই আমরা তৌহিদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি দিয়ে থাকি।

যদি রাসূলকে একমাত্র আদর্শ মনে করা হতো এবং রাসূলের জীবনকে পূর্ণরূপে অনুসরণ করাকে ইসলামী জীবনের লক্ষ্য মনে করা হতো তাহলে ইকামাতে দ্বীনের সংগ্রাম বা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ-কে অবশ্য কর্তব্য মনে করা হতো। ইসলামী আইন চালু করার চেষ্টা বা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলন না করলে রাসূলকে যে সত্যিকারভাবে অনুসরণ করা হয় না একথা বুঝতে অসুবিধা হতো না।

রাসূল (সঃ) ছাড়াও বড় আলেম, পীর বা বুযর্গকে আদর্শ মনে করার কারণেই কেউ মাদ্রাসার মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত করাকেই যথেষ্ট মনে করেন, কেউ ওয়ায করেই দ্বীনের দায়িত্ব পালন হলো বলে ধারণা করেন, কেউ ইমামতিতেই সন্তুষ্ট আছেন। যদি রাসূল (সঃ)-কে একমাত্র আদর্শ মনে করতেন তাহলে এটুকু খেদমত করার পরও দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য পেরেশান হতেন। তাবলীগ জামায়াতের দায়িত্বশীল মুরুব্বিগণ যদি রাসূল (সঃ)-এর ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনকে আসল আদর্শ মনে করেন তাহলে এ জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রঃ)-এর রচিত ছয় উসূলের কর্মসূচীকে প্রাথমিক খেদমত বলেই ধারণা করবেন। তাহলে তাবলীগের বর্তমান কর্মসূচীকেই হুবহু রাসূলের পরিচালিত আন্দোলন বলে কেউ মনে করবে না। কিন্তু রাসূল (সঃ) যদি শ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসেবে সামনে না থাকে তাহলে হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রঃ)-কেই আদর্শ মনে করে তার রচিত কর্মসূচীকেই ইসলামের চূড়ান্ত কর্মসূচী বলে কেউ মনে করতে পারে।

"উসওয়াতুন হাসানা" হিসেবে রাসূল (সঃ)-এর মর্যাদাকে সঠিকভাবে বুঝবার জন্য আরও একটা উদাহরণ বিশেষ সহায়ক হতে পারে। কলেজ ইউনিভার্সিটি ও মাদ্রাসার ছাত্রদের পাঠ্যসূচী সম্পর্কে যে সিলেবাস বা নেসাব রচনা করা হয় সেখান থেকেই ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্ন তৈয়ার হয়। যদি ছাত্ররা ঐ সিলেবাস সম্বন্ধে খুব সজাগ না থাকে এবং শিক্ষকরা সিলেবাস সবটুকু যাতে পড়ান সেদিকে যদি ছাত্ররা লক্ষ্য না রাখে এবং সিলেবাস যদি সবটুকু পড়া না হয় তাহলে পরীক্ষায় পাশ হবার আশা কিছুতেই করা যায় না। ছাত্ররা শিক্ষকের প্রতি যত শ্রদ্ধাই দেখাক, সিলেবাস পড়া বাকী থাকলে পরীক্ষার ভাল ফল কখনও হবে না। কোন শিক্ষক যদি সিলেবাসের শুধু সহজ অংশটুকু পড়ায় এবং কঠিন

অংশ বাদ দেয় তাহলে ছাত্র যত ভালই হোক পরীক্ষায় ভাল ফলের আশা করা যায় না।

আল্লাহ পাক আখেরাতের পরীক্ষায় কামিয়াবীর জন্য রাসূল (সঃ)-এর গোটা জীবনকে সিলেবাস হিসেবে দিয়েছেন। মৃত্যুর পর কবর থেকেই ঐ সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্ন করা হবে। কোন লোককে এ প্রশ্ন করা হবে না যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) বা ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বা হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-কে অনুকরণ ও অনুসরণ করা হয়েছে কিনা ? কবর থেকে হাশর পর্যন্ত সবখানে যত প্রশ্ন করা হবে তার মূল কথাই হবে যে, রাসূলের আনুগত্য করা হয়েছে কিনা।

রাসূলকে সিলেবাসের সাথে তুলনা করলে সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে সব দ্বীনি ব্যক্তিত্বকে শিক্ষক বা উস্তাদের সাথে তুলনা করা চলে। আমরা সাহাবায়ে কেরাম থেকে রাসূলের জীবন সম্পর্কেই শিক্ষা নেই। রাসূলের সিলেবাস শেখার জন্যই সাহাবাদেরকে শ্রেষ্ঠ উস্তাদ মনে করতে হবে। রাসূলকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মেনে চলার প্রয়োজনেই ফেকার ইমামগণকে মানতে হয়। দুনিয়ার সব বিষয়ই যেমন উস্তাদ থেকেই শিখতে হয়, দ্বীনি যিন্দেগী শিখতে চাইলেও উস্তাদ দরকার। সে উস্তাদকে যে নামেই ডাকা হোক—কাউকে দ্বীনি জামায়াতের আমীর এবং কাউকে শায়েখ বা পীর বলা হোক—প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সবাই উস্তাদ। তাঁদের কাছ থেকে রাসূলের গোটা জীবনের সিলেবাস শেখার চেষ্টা করতে হবে। একই উস্তাদের কাছে গোটা সিলেবাস শেখা সম্ভব নাও হতে পারে। যদি আমরা রাসূলকে সিলেবাস মনে করি তাহলে সে উস্তাদের কাছে যেটুকু সিলেবাস শেখা যায় সেটুকু শেখার পরও বাকী সিলেবাস শেখার জন্য উস্তাদ তালাশ করতে হবে। কোন এক উস্তাদকেই সিলেবাস মনে করলে, তিনি যেটুকু শেখান সেটুকুকেই যথেষ্ট মনে করলে আখেরাতের ফাইনাল পরীক্ষায় বিপদে পড়তে হবে।

দেশে এত আলেম, পীর ও খাদেমে দ্বীন থাকা সত্ত্বেও ইকামাতে দ্বীনের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব না দেয়ার আসল কারণ এটাই। রাসূলকে সিলেবাস হিসেবে গ্রহণ না করে উস্তাদদের অনুসরণ করাই যথেষ্ট মনে করা হচ্ছে। এ মহা ভুল যদি ভাংগে তাহলে ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব সবাই বোধ করতে সক্ষম হবেন।

❑

উপমহাদেশের বড় বড় ওলামা ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন করেননি কেন ?

মুসলমানদের হাত থেকে ইংরেজরা এ উপমহাদেশের রাজত্ব কেড়ে নেবার পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রায় আড়াই শ' বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করলে এ প্রশ্নের জবাব সহজে বুঝে আসবে। অনেকেই এ ইতিহাসের গুরুত্ব দেন না। বর্তমানে ওলামা সমাজ যে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছেন তারা এ ইতিহাস জানলে নিজেদের করণীয় সম্পর্কে বিবেচনা করতে পারবেন। তাই অতি সংক্ষেপে দীর্ঘ ইতিহাসের পাতা থেকে কিছু যরুরী ঘটনার বিশ্লেষণ করছি।

পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্ব শুরু হবার পর সকল ময়দানে যখন মুসলমানদের উপর যুলুম ও নির্যাতন ব্যাপক হয়ে উঠল তখন নতুন করে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার এক মহান আন্দোলন রাজ্যহারা মুসলিমদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করল। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রঃ)-এর বিপ্লবী ইসলামী চিন্তাধারার সূত্র ধরে মাওলানা সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী (রঃ) ও মাওলানা শাহ ইসমাঈল দেহলভী (রঃ)-এর নেতৃত্বে তাহরীকে মুজাহিদীনের (মুজাহিদ আন্দোলন) মাধ্যমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়। সুদূর বাংলা থেকেও বহু মুজাহিদ সে আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন। ১৮৩১ সালে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের মাঝামাঝি বালাকোট নামক স্থানে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ঐ দু'জন মহান মুজাহিদ নেতা শহীদ হন এবং ইংরেজ ও শিখদের সম্মিলিত শক্তির নিকট তাদের মুজাহিদ বাহিনী পরাজিত হবার ফলে ঐ ইসলামী রাষ্ট্রটি আর টিকে থাকতে পারেনি।

শহীদাইনে বালাকোট নাম প্রসিদ্ধ ঐ দু'জন মহান মুজাহিদ নেতা ইসলামী আন্দোলন ও ইকামাতে দ্বীনের এমন গভীর চেতনা মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন যে, ইংরেজের সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত মুসলিমদের মধ্যেও বালাকোটের পরাজয়ের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তাদের মধ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ধূমায়িত হয়ে উঠলো এবং ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের রূপ লাভ করলো। এ বিদ্রোহে মুসলমান

সিপাহীরাই প্রধান ভূমিকা পালন করার ফলে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ মুসলমানদের উপর খড়গ হস্ত হয়ে উঠল।

তখন মুসলমানদের চরম দুর্দিন। উপমহাদেশের হিন্দু ও শিখদের সাহায্য নিয়ে ইংরেজ রাজত্ব মযবুত হতে থাকল। ইংরেজরা সকল ময়দানে অমুসলিমদেরকে অগ্রসর করে মুসলমানদেরকে দ্বিগুণ গোলামীর যিঞ্জিরে আবদ্ধ করল। ইংরেজদের রাজনৈতিক গোলামী ও হিন্দু শিখদের অর্থনৈতিক দাসত্ব মিলে মুসলিম জাতিকে চিরতরে দাবিয়ে রাখার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করল।

পরাজিত, পর্যুদস্ত ও নিষ্পেষিত মুসলিম জাতি যখন দিশেহারা তখন ইংরেজ রাজ্যের অধীনে থেকেই শিক্ষা, চাকুরী, ব্যবসা ইত্যাদি ময়দানে হিন্দু ও শিখদের পাশাপাশি মুসলমানদেরকে অগ্রসর করার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে স্যার সাইয়েদ আহমাদ আলীগড় শিক্ষা-আন্দোলন শুরু করেন। ইংরেজের সাথে আপোষের মনোভাব নিয়ে ইংরেজী ভাষা শিখে যাতে মুসলমানরা আবার নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে সে দরদী মন নিয়েই তিনি এ পথে পা বাড়ান। ইসলামের দৃষ্টিতে এ পরাজিত মনোভাব আপত্তিকর হলেও তিনি পরম আন্তরিকতার সাথেই এ পদক্ষেপ নিলেন। এমন কি এ পরাজিত মনোভাবের ফলে তিনি কুরআনের এমন ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করলেন যা সত্যিকার ওলামা মহলকে বিচলিত করল। এরই ফলে শুরু হল দেওবন্দ আন্দোলন।

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুভী (রঃ)-এর নেতৃত্বে মাওলানা শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভীর চিন্তাধারার পথ ধরে কুরআন ও হাদীসের সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে ইসলামের হেফাযতের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে দেওবন্দে দারুল উলুম প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ গোটা উপমহাদেশে অগণিত মাদ্রাসা ঐ আন্দোলনেরই ফসল।

আলীগড় আন্দোলন ইংরেজের সাথে লড়াই-এর পরিবর্তে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে। আর দেওবন্দ আন্দোলন ইংরেজের গোলামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাবকে টিকিয়ে রাখারই চেষ্টা করে। কিন্তু বালাকোটের পরাজয়ের পর এবং সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার ফলে মুসলমানদের পক্ষে এককভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান আর সম্ভব হয়নি।

১৯১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর তুরস্কের মুসলিম খেলাফতকে ইংরেজরা যখন খতম করার ব্যবস্থা করল তখন খেলাফত রক্ষার পক্ষে এক আন্দোলনের মাধ্যমে উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে আবার জাগরণ দেখা দেয়। খেলাফত আন্দোলনের নামে খ্যাত এ আন্দোলন মুসলমানদেরই নেতৃত্বে শুরু হয় এবং এতে দেওবন্দের ভূমিকা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ছিল।

মিঃ গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলন এ সুযোগে ইংরেজ বিরোধী এ খেলাফত আন্দোলনের সাথে সহযোগিতা করে দেওবন্দের সাথে ঘনিষ্ঠ হলো। কিন্তু খেলাফত আন্দোলনও ব্যর্থ হলো। ফলে দেওবন্দের নেতৃত্বে গঠিত জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ নামক নিখিল ভারত ওলামা সংগঠন আরও ইংরেজ বিদ্বেষী হয়ে পড়ল। ইখলাসের সাথেই ওলামায়ে হিন্দ বিশ্বাস করতেন যে, ইংরেজদেরকে ভারত থেকে না তাড়ান পর্যন্ত মুসলমানদের কোন উন্নতি হতে পারে না এবং ইসলামী খেলাফত কায়েমও সম্ভব নয়। তারা একথাও বিশ্বাস করতেন যে, মুসলমানদের একক চেষ্টায় ইংরেজকে তাড়িয়ে দেশ আযাদ করা সম্ভব নয়। তাই ওলামায়ে হিন্দ গান্ধী ও নেহরুর নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে মিলেই ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করতে চেষ্টা করলেন।

অপরদিকে আলীগড় আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানদের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাদেরকে স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু বিদ্বেষী করে তুলল। তারা দেখল যে, ইংরেজী শিক্ষায় অগ্রসর হিন্দু সম্প্রদায় সরকারী চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সব রকম পেশা দখল করে এমনভাবে জেঁকে বসে আছে যে, শিক্ষিত হয়েও মুসলমানরা কোথাও পাত্তা পাচ্ছে না। ইংরেজরা তো হিন্দুদেরকে আগে থেকেই একচেটিয়া অধিকার দিয়ে রেখেছিল। এখন সব ময়দানে মুসলমানরা ভাগ বসাতে চায় দেখে হিন্দুরা সব জায়গায় মুসলমানদেরকে কোণঠাসা করে রাখার চেষ্টা করল। চাকুরী, ব্যবসা ও বিভিন্ন পেশায় হিন্দুদের এ আচরণ আধুনিক শিক্ষিত মুসলিমদেরকে হিন্দু-বিদ্বেষী করাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ওলামাদের সাথে এ ব্যাপারে হিন্দুদের কোন সংঘর্ষ ছিল না। হিন্দুদের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হলে সর্বত্র যে হিন্দু প্রাধান্য সৃষ্টি হবে সে কথা আধুনিক শিক্ষিত

মুসলিম সমাজ যেভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছিল ওলামা সমাজের পক্ষে তা বুঝা সম্ভব ছিল না। কারণ মুসলিম সমাজের যে ময়দানে ওলামারা কাজ করেছিলেন সেখানে হিন্দুদের সাথে তাদের স্বার্থের সংঘর্ষ হবার কোন সুযোগ ছিল না এবং হিন্দুদের সাথে কোথাও ওলামাদের প্রতিযোগিতার কারণ ঘটেনি।

কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হলেও মুসলমানরা হিন্দুর গোলামই থেকে যাবে বলে শিক্ষিত মুসলিম সমাজ তীব্রভাবে অনুভব করল। পাকিস্তান আন্দোলন এ অনুভূতিরই সৃষ্টি। মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ দাবী করল মুসলমান সংখ্যা গুরু এলাকায় মুসলমানদের পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হতে হবে। এ দাবী ইংরেজ ও হিন্দুর গোলামীতে পিষ্ট মুসলিম সমাজে নব জাগরণ সৃষ্টি করল। মিঃ জিন্নাহ মুসলমানদের নিকট কায়েদে আযম (শ্রেষ্ঠ নেতা) হবার মর্যাদা পেলেন।

মুসলমানদের এ পৃথক আন্দোলন বিচলিত হয়ে কংগ্রেস দাবী করল যে, ভারতের সব ধর্মের লোকই ভারতীয় জাতি হিসেবে এক জাতি। ধর্মের ভিত্তিতে এ মহান জাতিকে বিভক্ত করা কিছুতেই উচিত নয়। কংগ্রেসের এ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ দাবী করল যে, মুসলমানদের আদর্শ ইসলাম এবং ইসলাম শুধু ধর্ম নয়। তাই ইসলামী জীবন বিধানের ভিত্তিতে মুসলমানরা একটি ভিন্ন জাতি। সে হিসেবে ভারতে দুটো জাতি রয়েছে। ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী মুসলিম জাতি এ আদর্শে অবিশ্বাসীদের সাথে মিলে এক জাতি হতে পারে না। এ মতবাদই দ্বিজাতি তত্ত্ব বা 'টুনেশান থিউরী' হিসেবে বিখ্যাত।

এভাবেই কংগ্রেসের এক জাতি তত্ত্ব ও মুসলিম লীগের দ্বিজাতি তত্ত্বে যখন বিরোধ বাধল তখন ওলামায়ে হিন্দ কংগ্রেসের পক্ষেই সমর্থন জানাল। ওলামায়ে হিন্দ নেতা হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী (রঃ) এ বিষয়ে ১৯৩৮ সালে লাহোর শাহী মসজিদে যে বিখ্যাত বক্তৃতা করেন তাতে তিনি একজাতি তত্ত্বকে ইসলাম বিরোধী নয় বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। তার ঐ বক্তৃতাটি "মুত্তাহিদা কাওমিয়াত আওর ইসলাম" (একজাতি তত্ত্ব ও ইসলাম) নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯ সালে এ বক্তৃতার সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করে কুরআন ও হাদীস ও ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাস থেকে বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে মাওলানা

মওদূদী (রঃ) প্রমাণ করেন যে, কংগ্রেসের একজাতি তত্ত্ব ইসলামী জাতীয়তার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁর এ বইটি "মাসালায়ে কাওমিয়াত" (জাতীয়তা সমস্যা) নামে প্রকাশিত হয় বাংলা ভাষায় এর অনুদিত বইটির নাম 'ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ'।

জাতীয়তা নিয়ে এ বিতর্কের ফলে ভারতকে অখণ্ড রেখে স্বাধীন করার কংগ্রেসী আন্দোলন ও মুসলমানদের পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েমের মুসলিম লীগের আন্দোলন রাজনৈতিক ময়দানে চরম তিক্ততা সৃষ্টি করে। বিশেষ করে কংগ্রেস সমর্থক ওলামায়ে হিন্দের বিরুদ্ধে মুসলিম শিক্ষিত সমাজ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। এর প্রতিক্রিয়া ওলামা সমাজেও দেখা দেয়। দেওবন্দের অধিকাংশ ওলামা কংগ্রেসের সাথে গেলেও মাওলানা শাব্বীর আহমাদ ওসমানী (রঃ) ও মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রঃ)-এর নেতৃত্বে অনেক ওলামা পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে ১৯৪৩ সালে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম নামে ওলামাদের একটি পাল্টা সংগঠন কায়েম করে মুসলিম লীগকে সমর্থন করেন। মাওলানা জাফর আহমাদ ওসমানী (রঃ), মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রঃ), মাওলানা মুফতী দ্বীন মুহাম্মাদ খান (রঃ), শর্ষিনার পীর সাহেব ও ফুরফুরার পীর সাহেব প্রমুখ অনেক ওলামা পাকিস্তান আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন দেন। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ)-ও মুসলিম লীগকে সমর্থন দেন।

এভাবে ওলামায়ে কেরাম বিভক্ত হয়ে একদল কংগ্রেসের অখণ্ড ভারত মতবাদের সমর্থন করেন এবং অন্যদল ভারত বিভাগ করে পাকিস্তান কায়েমের পক্ষ অবলম্বন করেন। এতে যে তিক্ততা সৃষ্টি হয় তার ফলে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ওলামায়ে হিন্দকে কংগ্রেসের দালাল বলে গালি দেয়া হয় এবং ওলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে মুসলিম লীগকে স্বাধীনতার বিরোধী ও ইংরেজের দালাল আখ্যা দেয়া হয়।

ঐ সময় আমি পাকিস্তান আন্দোলনের একজন ছাত্রকর্মী হিসেবে ওলামায়ে হিন্দের সম্পর্কে যে মনোভাবই পোষণ করতাম, পরবর্তী কালে সমস্ত ঘটনাকে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বিচার করে আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ওলামায়ে হিন্দ মুসলিম লীগ নেতাদের দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়া সম্ভব বলে সংগত কারণেই বিশ্বাস করতেন না। তাই দেশ

ভাগ করে মুসলিম জাতিকে দু' দেশের মধ্যে বিভক্ত করা তারা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেননি। কিন্তু কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতের মতবাদ যে মুসলিমদের জন্য মারাত্মক ছিল সে বিষয়ে সংগত কারণেই তাদের ধারণা ছিল না। আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। একথা আমার বিশ্বাস করা সম্ভব নয় যে, মাওলানা মাদানী (রঃ)-এর মতো ব্যক্তি ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি হবে বুঝেও দুনিয়ার কোন স্বার্থে কাজ করতে পারেন। এ মানের লোকদের নিয়তের উপর হামলা করার সাহস আমার নেই। ভুল এক কথা, আর বদ-নিয়তে কাজ করা অন্য কথা।

যা হোক, উপমহাদেশের ওলামা সমাজ বিভক্ত হয়ে একদল কংগ্রেস সমর্থক ও অন্যদল মুসলিম লীগ সমর্থকের ভূমিকায় যখন সক্রিয়, তখন মাওলানা মওদূদী তাঁর "তারজুমানুল কুরআন" নামক মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে এমন একটি তৃতীয় দৃষ্টিভংগী পেশ করলেন যা ওলামায়ে কেরামের উভয় দলকেই অসন্তুষ্ট করল। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মাওলানার বইটি মুসলিমলীগ পন্থী ওলামায়ে কেরাম মাওলানা মাদানী (রঃ)-এর একজাতি তত্ত্বের মতবাদের বিরুদ্ধে একটি মযবুত হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগান। কিন্তু ১৯৪০ সালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে মাওলানা মওদূদীর "ইসলামী হুকুমাত কিস্ তারাহ কায়েম হোতী হ্যায়" (বাংলায় অনুদিত বইটির নাম—ইসলামী বিপ্লবের পথ) নামক বক্তৃতায় মুসলিম লীগ মহল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। সে বক্তৃতায় তিনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন যে, দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিমদের পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন অত্যন্ত সঠিক ও পূর্ণ সমর্থন যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম দেশ কায়েম হলেও কিছুতেই তারা ইসলামী হুকুমাত বা সরকার কায়েম করতে পারবে না। নবী করীম (সঃ)-এর আন্দোলনের বিশ্লেষণ করে তিনি দেখালেন যে, ইসলামকে জানে এবং নিজেদের জীবনে মানে এমন নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী তৈরীর কোন কর্মসূচী না থাকায় মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে শুধু অক্ষমই হবে না বরং ইসলাম কায়েমের চেষ্টা করলে তারা সে আন্দোলনের নেতাকে ফাঁসি দেয়া প্রয়োজন মনে করবে। এ বক্তৃতার ঠিক ১৪ বছর পর সত্যিই তাঁর এ অনুমান সত্য প্রমাণিত হয়। ১৯৫৩ সালে মুসলিম লীগ শাসনামলে তাঁকে এক অজুহাত দেখিয়ে ফাঁসির হুকুম দেয়া হয়েছিল।

মাওলানা মাদানী (রঃ)-এর একজাতি তত্ত্বের বিরুদ্ধে মাওলানা মওদূদীর বইটি প্রকাশিত হবার পর দেওবন্দ থেকে ক্রমাগত মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে ফতোয়া বের হতে থাকে। কংগ্রেসকে সমর্থন করা মুসলমানদের কিছুতেই উচিত নয় বলে মাওলানা মওদূদী যত জোরালোভাবে লিখতে থাকলেন ততই ফতোয়ার সংখ্যাও বাড়তে থাকল। এভাবেই মাওলানা মওদূদী একদিকে কংগ্রেস সমর্থক ওলামায়ে কেরামের ফতোয়ার শিকারে পরিণত হলেন, অপরদিকে মুসলিম লীগ মহলের নিকটও নিন্দনীয় হলেন। অবশ্য পাকিস্তান কায়েম হবার পূর্ব পর্যন্ত মাওলানা মওদূদীর কতক লেখা পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক ছিল বলে মুসলিম লীগ নেতারা তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেননি। কিন্তু পাকিস্তান কায়েম হবার পর তিনি ১৯৪৮ সালে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার দাবী তুলবার সাথে সাথেই তাঁকে পাকিস্তান বিরোধী বলে গ্রেফতার করে বিনা বিচারে জেলে আটক করা হয়।

মাওলানা মওদূদী দ্বিজাতি তত্ত্বের পক্ষে তাঁর বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠতম রচনা দ্বারা পাকিস্তান আন্দোলনকে শক্তিশালী করা সত্ত্বেও তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেননি। ১৯৪০ সালে আলীগড়ে পূর্বোল্লিখিত বক্তৃতার পর এক বছর ক্রমাগত তিনি তার মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে মুসলিম লীগ নেতাদের নিকট এমন কতক কর্মসূচীর প্রস্তাব দেন যা না হলে পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র বানান যাবে না। কিন্তু লীগ নেতারা কোন সাড়া না দেয়ায় তিনি ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে লাহোরে আগত ৭৫জন লোক নিয়ে ঐসব কর্মসূচীর ভিত্তিতে "জামায়াতে ইসলামী"র সংগঠন শুরু করেন। ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের ঐসব প্রস্তুতিমূলক কাজ করার ফলেই পাকিস্তান কায়েম হবার পর ইসলামী শাসনতন্ত্রের আন্দোলন মুসলিম লীগ সরকারের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও এত জোরদার হয়।

বালাকোট ময়দানে ১৮৩১ সালে সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী (রঃ) ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (রঃ)-এর শাহাদাতের পর তাদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের পতন হয়। এর পর দীর্ঘ একশ' বছর মুসলমানদের মধ্যে কী অবস্থা বিরাজ করছিল, এর সংক্ষিপ্ত একটা ধারণা এখানে দেয়ার চেষ্টা করলাম। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, কেন একশ' বছরের

মধ্যেও ইকামাতে দ্বীনের আর একটি আন্দোলন শুরু হতে পারেনি। ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন যখন জোরদার হয়ে উঠল এবং মুসলমানরা যখন আবার জেগে উঠে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবী জানাবার মতো শক্তি পেলো তখনই ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন গড়ে তুলবার পরিবেশ সৃষ্টি হলো। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের স্বপ্ন আবার মুসলমানদের মনে সাড়া জাগালো। এ সময় যদি বড় বড় ওলামাগণ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের পেছনে না যেয়ে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারতেন তাহলে হয়তো উপমহাদেশের ইতিহাস ভিন্নরূপ হতো। পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলবার মহান উদ্দেশ্য হয়তো পূর্ণ হতো। উপমহাদেশের মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে ঐ উপযুক্ত সময়ে ওলামায়ে কেরাম "ইকামাতে দ্বীনের ডাক" দিতে পারলেন না।

এ ডাকই দিলেন মাওলানা মওদূদী ১৯৪১ সালে।* তখন তার বয়স মাত্র ৩৮ বছর। কিন্তু সে সময় বড় বড় ওলামা প্রায় সবাই কংগ্রেস বা লীগে বিভক্ত। অথচ ঐ দু' পথের কোনটাই ইসলামী নেতৃত্বে পরিচালিত ছিল না। এ থেকেই মনে হয় যে, তখনকার রাজনৈতিক পরিবেশে ওলামায়ে হিন্দের নিকট ইংরেজ থেকে আযাদী হাসিলই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আর লীগ পন্থী ওলামাদের নিকট দেশ ভাগ করে স্বাধীন মুসলিম দেশ কায়েমই আসল লক্ষ্য ছিল। এ দুটো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিজেরা নেতৃত্ব দেয়ার মতো পজিশনে তারা ছিলেন না। তাই তাদেরকে কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের পেছনেই চলতে হয়েছে।

ইতিহাসের ঐ তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের আলেম সমাজকে সঠিক শিক্ষাগ্রহণ করতে হলে তাদেরকে গভীরভাবে এবং ধীরচিত্তে চিন্তা করতে হবে। ইকামাতে দ্বীনের দাওয়াত ও কর্মসূচী নিয়ে এ দেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার আন্দোলন করাই যে দ্বীনের দাবী তা উপলব্ধি করার সময় এসেছে। বিলম্ব করলে বোখারার ন্যায় চির গোলামী, আর না হয় আফগানিস্তানের মতো মুসিবতে পড়বার আশংকা রয়েছে। খোদা না করুন এমন অবস্থা হলে যেটুকু দ্বীনের খেদমতে ওলামাগণ এখন নিযুক্ত আছেন এটুকুর সুযোগও থাকবে কিনা সন্দেহ।

---

* "জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী" নামক বইতে এ সংগঠনের সূচনাকালের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

জামায়াতবদ্ধ প্রচেষ্টার গুরুত্ব

ইকামাতে দ্বীনের কাজ কারো পক্ষে একা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এমন কি শত যোগ্যতা সত্ত্বেও কোন নবীও একা দ্বীনকে বিজয়ী করতে পারেননি। অবশ্য প্রথমে নবীকে একাই শুরু করতে হয়েছে। যে নবীর ডাকে মানুষ সাড়া দেয়নি এবং জামায়াতবদ্ধভাবে কাজ করার সুযোগ যে নবী পাননি তিনি দ্বীনকে বিজয়ী করতে পারেননি।

একটা সমাজ ব্যবস্থাকে বদলিয়ে নতুন করে সে সমাজকে গড়ে তুলবার কাজটি এমন কঠিন ও জটিল যে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক একদল লোকের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া এ বিরাট উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হতে পারে না। তাই প্রত্যেক নবীই মানুষকে আল্লার দাসত্ব কবুলের দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথে তাঁর আনুগত্য করে ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব পালনে তাঁর সাথী হবার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ - (الشعراء : ١٥٠) অর্থ ঃ "আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।" প্রত্যেক নবীই এ দাওয়াত দিয়েছেন। কারণ একদল লোকের আনুগত্য না পেলে দ্বীনকে বিজয়ী করা সম্ভব নয়।

এ কারণেই ইসলামে জামায়াতের গুরুত্ব এতবেশী। রোজ পাঁচ ওয়াক্ত জামায়াতের সাথে নামায আদায়ের নির্দেশ দিয়ে জামায়াতবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব গভীরভাবে অনুভব করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমন কি জামায়াতী যিন্দেগীকে ইসলামের আনুগত্যের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যে জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন তাকে হাদীসে এ বলে সাবধান করা হয়েছে যে, মেষের পাল থেকে বিচ্ছিন্ন মেষকে যেমন নেকড়ে বাঘ ধরে নিয়ে যায় তেমনি শয়তান জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে নিজের খপ্পরে নিয়ে নেয়।

এমন কি সফরের সময় দু'জন এক সাথে সফর করলেও একজনকে আমীর মেনে জামায়াতের শৃংখলা মতো চলার জন্য রাসূল (সঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। জামায়াত ছাড়া ইসলামী যিন্দেগী সম্ভব নয় এবং আমীর ছাড়াও জামায়াত হতে পারে না। এ দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, একজন মুসলিম হয় আমীর (হুকুমকর্তা) হবে, না হয় মামুর (হুকুম

পালনকারী) হবে। যেমন জামায়াতে নামায আদায় করা অবস্থায় তাকে হয় ইমাম হতে হবে, না হয় মুক্তাদী হতে হবে। কেউ যদি ইমাম বা মুক্তাদির কোনটাই না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, সে নামাযের জামায়াতে শামিল হয়নি। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন দ্বীনি জামায়াতে শামিল হয়নি সে সঠিক ইসলামী জীবন যাপনের কর্মসূচী গ্রহণই করেনি। এ অবস্থায় সে নাফস ও শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকতে পারবে না।

নবী করীম (সঃ)-এর সময়ে শুধু তারাই মুসলিম বলে গণ্য হতেন যারা নবীর জামায়াতে শরীক হয়ে নবীর নিকট বা তাঁর প্রতিনিধির নিকট বাইয়াত হতেন। ঐ জামায়াতের বাইরে থাকলে মুসলিম বলে গণ্যই হতো না। ঐ জামায়াতই দ্বীনের একমাত্র জামায়াত বা আল-জামায়াত ছিল। বর্তমানে কোন এক জামায়াতই আল-জামায়াতের মর্যাদা পেতে পারে না। রাসূলের আদর্শের ভিত্তিতে যত জামায়াত গঠিত হতে পারে সব জামায়াত মিলে আল-জামায়াত বলে গণ্য। কিন্তু যে কোন দ্বীনি জামায়াতে শামিল-ই হয়নি সে ঈমানের দিক দিয়ে মোটেই নিরাপদ অবস্থায় নেই।

ইসলামে জামায়াতের এ গুরুত্বকে কোন আলেমই অস্বীকার করতে পারবেন না। আল্লার দ্বীনের খেদমতের জন্য হলেও কোন জামায়াত ভুক্ত হওয়া হাদীসের দৃষ্টিতে কমপক্ষে ওয়াজেব বলে স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। সুতরাং প্রত্যেক সচেতন মুসলিমকেই কোন না কোন একটি জামায়াতে শামিল হতে হবে। প্রচলিত জামায়াতগুলোর কোনটাই যদি পছন্দ না হয় তাহলে এমন ব্যক্তিকে একটা নতুন জামায়াত গঠন করার চেষ্টা করা উচিত। সব জামায়াতকে পয়লা জানবার চেষ্টা করা কর্তব্য। এরপরও যে ব্যক্তি সব কটা জামায়াতকে ক্রুটিপূর্ণ বলে বুঝবার যোগ্যতা রাখেন তার ঐসব ক্রুটি থেকে মুক্ত একটা জামায়াত গঠন করার যোগ্য হওয়া উচিত। অবশ্য একটা কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে প্রত্যেক দ্বীনি জামায়াতকে ভালভাবে জানবার চেষ্টা করা সবারই দায়িত্ব। প্রত্যেক জামায়াতকে কাছে এসেই জানতে হবে এবং সে জামায়াতের দায়িত্বশীল লোকদের কাছ থেকে জানতে চেষ্টা করতে হবে। উড়ো কথায় কান দিয়ে বা কোন জামায়াতের বিরোধীদের প্রচার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে এ বিষয়ে

সিদ্ধান্ত নেয়া একেবারেই অযৌক্তিক। যে বিচারক বাদীর অভিযোগ শুনেই আসামীর যবানবন্দী না নিয়ে রায় দেয় সে বিচারক হবারই যোগ্য নয়। তাই কোন জামায়াত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হলে সে জামায়াতকে কাছে এসে দেখা দরকার।

তাবলীগ জামায়াতের ভাইয়েরা একথাটা খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে থাকেন। তারা বলেন যে, তাবলীগ জামায়াত কেমন তা যদি সঠিকভাবে জানতে চান তাহলে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য জামায়াতে সময় দিন এবং সাথে থাকুন। তাবলীগের ভাইদের একথাটা খুবই যুক্তিপূর্ণ। এ যুক্তিটা কিন্তু সব জামায়াতের ব্যাপারেই সত্য। তাবলীগী ভাইয়েরাও যদি অন্য জামায়াত সম্পর্কে জানতে চান তাহলে তাদেরকেও একটু সময় দিয়ে সে জামায়াতকে জানতে হবে। শুধু তাবলীগে কাজ করলে অন্য জামায়াতের সাথে তুলনা করার যোগ্যতা কি করে হবে?

আমি যদি তাবলীগ জামায়াতে কাজ করার সুযোগ না পেতাম তাহলে দূর থেকে এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন করতে পারতাম না। এভাবে আমার তামাদ্দুন মজলিস সম্বন্ধেও জানবার সুযোগ হয়েছে। ইসলাম যে একটা আদর্শিক আন্দোলন এ বিষয়ে এ মজলিসের মাধ্যমেই আমার প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। আমি তিন বছর একই সাথে তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিসে কাজ করেছি। একটিতে ইসলামের ধর্মীয় দিকের চর্চা করার সুযোগ পেয়েছি এবং অন্যটিতে ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকের ইংগিত পেয়েছি। যখন জামায়াতে ইসলামীকে জানবার সুযোগ হলো তখনই ইসলামের সবদিক একই জামায়াতে পেয়ে এখানে যোগদান করেছি। অবশ্য তাবলীগ ও তামাদ্দুনের অবদানকে আমি অন্তর দিয়ে স্বীকার করি। এভাবে তুলনা করার সৌভাগ্য না হলে যে জামায়াতে কাজ করছি সেখানেও তৃপ্তিবোধ করতে সক্ষম হতাম না।

যে কটি জামায়াতকে আমার জানবার সুযোগ হয়েছে তার মধ্যে যেটিকে আমি সর্বশেষে গ্রহণ করেছি সেটাই সবার গ্রহণ করা কর্তব্য বলে আমি বলি না। আমার বক্তব্য হলো যে, সব ক'টা দ্বীনি জামায়াত সম্পর্কে সচেতন মুসলমানদের ভালভাবে জানার চেষ্টা করা উচিত। তুলনামূলকভাবে বিচার করে যে যেটাকে বেশী পছন্দ করবেন সেখানে

কাজ করে তিনি বেশী তৃপ্তি পাবেন। আর তুলনা করলে সব জামায়াতেরই দ্বীনি খেদমতটুকুকে স্বীকার করতে সক্ষম হবেন। এক জামায়াতকে বেশী পছন্দ করার অর্থ এ নয় যে, অন্যান্য জামায়াতকে মন্দ মনে করতে হবে। একটা "বেশী ভাল" বলে স্বীকার করেও অন্যটাকে অন্ততঃ "শুধু ভাল" মনে করা উচিত। একটাকে বেশী পছন্দ করলেই অন্য সবগুলোকে মন্দ মনে করা কোন অবস্থায় যরুরী নয়।

❐

ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে গঠিত জামায়াতের বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক সংগঠন, জামায়াত বা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। স্বাভাবিকভাবে ঐ উদ্দেশ্যেই সেখানে লোক তৈরী করার পরিকল্পনা থাকে। যেমন মাদ্রাসা কায়েম করা হয় আলেম তৈরী করার জন্য। যে ধরনের আলেম তৈরীর উদ্দেশ্য থাকে সে জাতীয় সিলেবাসই রচনা করা হয়। যারা কলেজ কায়েম করে তারা মাদ্রাসা থেকে ভিন্ন উদ্দেশ্যে লোক তৈরী করতে চায় বলে তাদের সিলেবাসও ভিন্ন। খানকার মাধ্যমে আল্লাহ ওয়ালা লোক তৈরীর যে প্রোগ্রাম থাকে তা দ্বারা ঐ মানের লোকই তৈরী হয়। তাবলীগ জামায়াতের ছয় উসূলের ভিত্তিতে এবং চিল্লা পদ্ধতিতে ঐ ধরনের লোকই তৈরী হচ্ছে যা এ কর্মসূচী দ্বারা তৈরী হওয়া সম্ভব। এ জামায়াত চেষ্টা করছে যাতে মানুষ দুনিয়ার যিন্দেগীতে মগ্ন হয়ে না থেকে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবন গড়ার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে বাড়ীঘর ও পেশা থেকে দূরে কিছুদিন তাবলীগের কাজে সময় খরচ করে। মানুষকে আখেরাতমুখী করা নিসন্দেহে দ্বীনি খেদমত।

কিন্তু যে সংগঠন বাতিল সমাজ ব্যবস্থাকে বদলিয়ে আল্লার বিধান ও রাসূলের আদর্শে সমাজকে গড়তে চায় তার কর্মসূচী এ বিরাট উদ্দেশ্যের উপযোগী হতে হবে। এ জাতীয় জামায়াতের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে ঃ

এক ঃ এ জামায়াতের দাওয়াত ইসলামের কতক অংশ বা দিকের প্রতি হতে পারে না। ইসলাম যতটা ব্যাপক এ জামায়াতের দাওয়াত ততটাই ব্যাপক হবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লার দাসত্ব ও রাসূলের আনুগত্যের প্রতি এ জামায়াতের দাওয়াত বিস্তৃত হবে। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহকে একমাত্র হুকুমকর্তা এবং রাসূল (সঃ)-কে একমাত্র আদর্শ নেতা মানার দাওয়াতই এ জামায়াত দিতে থাকবে।

দুই ঃ এ জামায়াত ইসলামের পূর্ণাংগ শিক্ষাকে মানব সমাজের নিকট তুলে ধরার চেষ্টা করবে। গোটা কুরআন পাককে বুঝবার জন্য সর্ব প্রকার চেষ্টা চালাবে। ঈমান, ইসলাম, তাকওয়া, ইহসান এবং নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, যিকির ও তাহাজ্জুদ থেকে নিয়ে পারিবারিক জীবন,

রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের অন্যান্য সমস্ত দিকে ইসলামের যাবতীয় শিক্ষাকে সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচার করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

তিন ঃ পূর্ণ দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য এ জামায়াত স্বাভাবিক কারণেই জনশক্তি সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে মানুষকে এ সংগঠনে শামিল করার চেষ্টা করবে। এ জাতীয় সংগঠনে যারাই আসবে তারা জামায়াতের উদ্দেশ্যকে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য মনে করেই আসবে। তারা জনগণকে এ মহান উদ্দেশ্যের সাথে একমত করার চেষ্টা করবে এবং ব্যক্তিগতভাবেও দাওয়াত দিয়ে মানুষকে জামায়াতে শামিল করতে থাকবে।

চার ঃ যারা জামায়াতে যোগদান করে তাদের মধ্যে ইকামাতে দ্বীনের কঠিন দায়িত্ব পালনের উপযোগী প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, চরিত্র ও গুণাবলী সৃষ্টির জন্য এ জামায়াত বিশেষভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যত প্রকার তারবিয়াত বা ট্রেনিং সম্ভব তার মাধ্যমে যোগ্য কর্মী বাহিনী সৃষ্টি করবে।

পাঁচ ঃ ইসলামকে বিজয়ী করার ডাক দিয়ে লোক সংগ্রহ করার ফলে এ সংগঠনের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত সরকার ও সর্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থ (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয়) সজাগ না হয়ে পারে না। বাতিল নেযাম বা দ্বীনে বাতিল এ জাতীয় জামায়াতকে তাদের জন্য বিপজ্জনক মনে করবে। তাই যত প্রকারে সম্ভব এ জামায়াতের অগ্রগতি রোধ করার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করবে। প্রয়োজন হলে ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থকেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। এ ধরনের জামায়াতের নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে সরকার ও অন্যান্য ইসলাম বিরোধী দল এক জোট হয়ে প্রচারণা চালাবে যাতে জনগণকে বিভ্রান্ত করা যায়। এ সংগঠনের শক্তি যাতে বৃদ্ধি না পায় সে জন্য দরকার হলে বিনা বিচারে বা মিথ্যা মামলার জালে জড়িয়ে নেতা ও কর্মীদেরকে জেলে পাঠাবে। এভাবে সর্বপ্রকার নির্যাতনের মাধ্যমে ইসলামকে বিজয়ী করার বিরুদ্ধে সকল কায়েমী স্বার্থ উঠে পড়ে লেগে যাবে।

ইসলামী জামায়াত হওয়া সত্ত্বেও যদি কায়েমী স্বার্থ কোন সংগঠনকে সহ্য করে এবং তাদের বিরুদ্ধে কিছু না করে তাহলে ধরে নিতে হবে যে,

এ জামায়াত ইসলামের বড় কোন খেদমত করলেও ইকামাতে দ্বীনের কোন কর্মসূচী নিয়ে কাজ করছে না। কায়েমী স্বার্থ বা প্রচলিত সরকার যদি কোন জামায়াতকে তাদের দুশমন মনে না করে তাহলে বুঝতে হবে যে, দ্বীনে হককে কায়েম করার কোন কর্মসূচী সে জামায়াতের নেই।

ছয় ঃ বাতিল শক্তি ও কায়েমী স্বার্থের এ বিরোধিতা ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী হয়। এ বিরোধিতার ফলে এ আন্দোলনে ভীরু ও কাপুরুষ জাতীয় লোক আসতে সাহস পায় না। দুনিয়ার স্বার্থই যাদের নিকট বড় তারাও এ পথে আসে না। এ পথের জন্য যে জাতীয় নিঃস্বার্থ সাহসী, সংগ্রামী ও জিহাদী মনোভাবের লোক দরকার সে ধরনের লোকই এ সংগঠনে শামিল হয়। একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে যারা ডরায় না তারাই এখানে টিকে থাকে। এ পথটাই এমন যে, যারা এ পথে পা বাড়ায় তাদেরকেই আল্লাহ পাক পরীক্ষা করেন।

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لاَيُفْتَنُوْنَ ○ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ○ (العنكبوت : ٢-٣)

অর্থ ঃ "মানুষ কি মনে করে যে, তারা 'ঈমান এনেছি' বললেই তাদেরকে বিনা পরীক্ষায় ছেড়ে দেয়া হবে ? অথচ তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করা হয়েছে।"-(সূরা আনকাবুত ঃ ২-৩)

ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন ছিল বলেই রাসূল (সঃ)-এর সময় সাহাবায়ে কেরামকে এত পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আজও যদি সে কাজ কোন জামায়াত করে তাহলে তাদেরকেও পরীক্ষা দিতেই হবে। এ পরীক্ষা ছাড়া এমন লোক যোগাড় হওয়া সম্ভব নয় যারা ইসলামকে কায়েম করার যোগ্য।

সাত ঃ ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনের আরও একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এ সংগঠনের কোন ব্যক্তিকে ইখলাস, তাকওয়া এবং আন্দোলনের জন্য কুরবানী ও নিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোন মাপকাঠিতে নেতা হিসেবে স্থান দেয়া হয় না। ক্ষমতা দখলই যেসব দলের আসল লক্ষ্য অন্য দলের কোন নেতাকে ঐসব দলে রাজনৈতিক সুবিধার জন্য নেতা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ইকামাতে দ্বীনের সংগঠনে কোন লোককে "রেডী-মেড" নেতা

হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ যে নেতৃত্বের খায়েশ রাখে তাকে নেতা বানান ইসলামী নীতির বিরোধী।

এ কারণেই এ সংগঠনে নেতা হবার কোন প্রতিযোগিতা হতে পারে না। নেতৃত্বের কোন কোন্দলও এখানে হওয়া অসম্ভব। নেতা হবার উদ্দেশ্যে কারো পক্ষে এ জাতীয় সংগঠনে ঢুকবার রাস্তাও থাকে না। কিন্তু কোন দলের নেতৃস্থানীয় ও যোগ্যতা সম্পন্ন লোক যদি নিষ্ঠার সাথে এ সংগঠনে শামিল হয় তাহলে তার আচরণ ও কর্মনীতিই তাকে সত্বর নেতৃত্বে পৌঁছিয়ে দেয়। কারণ এ ধরনের সংগঠনের দায়িত্বশীলরা যোগ্যতর লোক পেলে তাদের উপর দায়িত্ব দেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

এ জাতীয় সংগঠনে কেউ নেতা হবার চেষ্টা করে না। বরং নেতার যোগ্যতা সম্পন্ন লোককে নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হয় কোন ব্যক্তিকে শুধু খ্যাতি, টাকা-পয়সা বা ডিগ্রীর ভিত্তিতে নেতা বানান হয় না। আদর্শ ও চরিত্রের মাপকাঠিতেই নেতৃত্ব বাছাই করা হয়।

আট ঃ সত্যিকার ইসলামী জামায়াত কোন ব্যক্তি বিশেষকে আন্দোলনের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে না। ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে গঠিত জামায়াতের নিকট ইসলামী আদর্শই আসল আকর্ষণ। মানুষকে ঐ আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করাই এর বৈশিষ্ট্য। নবীর সংগঠনের কেন্দ্রবিন্দু ও ভিত্তি হলো নবীর ব্যক্তিত্ব। নবী ছাড়া সংগঠনের ভিত্তি অন্য কোন ব্যক্তিত্ব হওয়া উচিত নয়। কোন ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে যদি সংগঠন গড়ে তোলা হয় তাহলে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর এর অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু আদর্শই যদি সংগঠনের মূল ভিত্তি হয় তাহলে এর প্রতিষ্ঠানের মৃত্যু সংগঠনের অস্তিত্ব বিপন্ন করে না।

বাংলাদেশে এ জাতীয় জামায়াত আছে কি ?

যারা সত্যিই ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব অনুভব করেন তাদের নিকট এ প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকল দিক দিয়ে আকর্ষণীয় পূর্ণাংগ জামায়াত পাওয়া যায় না বলে অজুহাত দেখিয়ে ইকামাতে দ্বীনের কাজ না করলে আল্লার নিকট ঠেকতে হবে কিনা তা গভীরভাবে বিবেচনা করার বিষয়। মসজিদের ইমাম পছন্দ নয় বলে জামায়াতে শরীক না হয়ে একা নামায পড়া যেমন অন্যায় তেমনি আদর্শ জামায়াত না পেয়ে জামায়াতহীন জীবন যাপন করাও মস্তবড় ভুল।

আপনি যদি ইমাম হবার যোগ্য হন তাহলে নিয়মিত মসজিদে যেয়ে জামায়াতে নামায আদায করলে মুসল্লিরা অযোগ্য ইমামকে সরিয়ে আপনাকেই ইমাম বানাতে পারে। তখন মসজিদটি যোগ্য ইমাম পেয়ে আরও বেশী আবাদ হবে। তেমনি ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে যে জামায়াতকে তুলনামূলকভাবে আপনার পছন্দ হয় সে জামায়াতে শরীক হয়ে সেটাকেও আরও উন্নত করার চেষ্টা করতে পারেন। আর যদি আপনি নিজে একটা জামায়াত গঠন করার যোগ্যতা রাখেন তাহলে তা-ই করুন। কিন্তু কোন জামায়াত ছাড়া যে একা ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব কারো পক্ষে পালন করা কিছুতেই সম্ভব নয় সে কথা স্বীকার করতেই হবে।

এক সময়ে এ প্রশ্ন আমার মনেও বিরাট আকারে দেখা দিয়েছিল যে, আমি কোন্ জামায়াতের সাথে এ কাজ করবো ? পূর্বেই বলেছি, যে দুটো সংগঠনে একই সাথে আমি কাজ করছিলাম সে দুটো সংগঠনকে আমি এখনও মহব্বত করি। কিন্তু আমার বিবেক যখন আর একটি জামায়াতকে ইকামাতে দ্বীনের ব্যাপারে আরও বেশী উপযোগী বলে মনে করল তখন থেকে সে জামায়াতেই কাজ করছি। এ বিষয়টা সম্পূর্ণ প্রত্যেকের বিবেকের উপর নির্ভর করে। দ্বীনের জ্ঞান, ইকামাতের দায়িত্ববোধ ও ইসলামের ভিত্তিতে প্রত্যেককেই নিজের ব্যাপারে নিজেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমি যে সিদ্ধান্তে পৌছেছি সবাই সে সিদ্ধান্তে আমার সাথে একমত না-ও হতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকের দায়িত্ব

রয়েছে যে, ইকামাতে দ্বীনের জন্য যেসব বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন সে মাপকাঠিতে বিচার করেই পছন্দসই জামায়াত বাছাই করতে হবে।

ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্বটা এমন মামুলী বিষয় নয় যে, ভালভাবে তুলনা না করে এবং বিচার-বিবেচনা না করে হঠাৎ না বুঝেই কোন জামায়াতে ঢুকে পড়া যায়। যে জামায়াতে যাচ্ছি সেখানে ইকামাতে দ্বীনের উপযোগী দাওয়াত ও কর্মসূচী আছে কিনা, ইকামাতের যোগ্য লোক তৈরীর ব্যবস্থা কতটুকু সেখানে আছে এবং ইকামাতের জন্য প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলো কী পরিমাণ আছে তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই বাছাই করতে হবে।

আল্লাহ্ পাক আমাকে যতটুকু জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক দিয়েছেন তাতে ইকামাতের উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামীর চেয়ে উন্নত কোন জামায়াত আমি পাইনি। এ জামায়াতকে আরও উন্নত করা এবং এর মধ্যে যে যে দিকে কমতি রয়েছে বা ত্রুটি আছে তা দূর করার সাধ্যমতো চেষ্টা করছি। কারণ আমার বিচারে আদর্শ জামায়াত হচ্ছে একমাত্র সাহাবায়ে কেরামের জামায়াত। ঐ জামায়াতকে মাপকাঠি ধরে যখন বিচার করি তখন জামায়াতে ইসলামীতে অনেক অভাব ও অনেক ত্রুটি পাই। দেশের অন্যান্য জামায়াতের সাথে তুলনা করে জামায়াতে ইসলামীর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গৌরব করার মতো ক্ষুদ্র মন যাতে আমার না হয় সে জন্য আল্লার সাহায্য চাই। এ জামায়াত যদি ইকামাতে দ্বীনের মহান দায়িত্ব পালন করতে চায় তাহলে সাহাবায়ে কেরামের জামায়াতকে আদর্শ মনে করে ঐ মানে পৌঁছার যে পরিমাণ চেষ্টা সম্ভব তা-ই করতে হবে। প্রচলিত কোন দলের সাথে তুলনা করে আত্মতৃপ্তি বোধ করার কোন অবকাশ নেই।

আমি খালেস দ্বীনি জযবা নিয়ে ঘোষণা করছি যে, আল্লার দ্বীনকে এ দেশে কায়েম করার জন্য যদি জামায়াতে ইসলামীর চেয়ে আরও উন্নত কোন সংগঠন আমি পাই তাহলে এ জামায়াত ছেড়ে ঐ সংগঠনে যোগদান করা ফরয মনে করবো। কারণ ইকামাতে দ্বীনই আমার লক্ষ্য। সে মহান উদ্দেশ্য যে জামায়াতের মাধ্যমে হাসিল হওয়ার সম্ভাবনা ও আশা বেশী সে জামায়াতে শামিল হওয়াই আমি কর্তব্য বলে বিশ্বাস করি।

❑

জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদূদী (রঃ)

ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করা উচিত কিনা তা যোগদানকারীর বিবেচনার বিষয়। এ জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)। তিনি দুনিয়ায় এখন না থাকলেও যেহেতু তাঁর সম্পর্কে নানা কথা প্রচারিত আছে, সেহেতু বর্তমান জামায়াতে ইসলামীর সাথে মাওলানা মরহুমের কি সম্পর্ক সে বিষয়ে কিছু যরুরী কথা পেশ করছি ঃ

এক ঃ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) আজীবন একথার উপর জোর দিয়ে গেছেন যে, আল্লার রাসূল (সঃ) ছাড়া আর কোন ব্যক্তিকে অন্ধভাবে মানা উচিত নয়। একমাত্র রাসূলই ওহী দ্বারা পরিচালিত হবার কারণে নির্ভুল। অন্য কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়।

সুতরাং মাওলানা মওদূদীর কোন কথাকেই রাসূলের কষ্টি পাথরে যাচাই না করে আমি মানতে রাযী নই। কুরআন ও সুন্নার বিচারে তার মতামত যতটুকু গ্রহণযোগ্য মনে হয় আমি ততটুকুই গ্রহণ করি। এটাই জামায়াতে ইসলামীর নীতি।

১৯৪১ সালে যখন তিনি জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হন তখনি তিনি নিম্নরূপ ঘোষণা দেন ঃ

"পরিশেষে একটি কথা পরিষ্কার করে দিতে চাই। 'ফিকাহ' ও ইলমে কালামের বিষয়ে আমার নিজস্ব একটি তরীকা আছে। আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধান গবেষণার ভিত্তিতে আমি এটি নির্ণয় করেছি। গত আট বছর যারা 'তারজুমানুল কুরআন' পাঠ করেছেন তারা একথা ভালভাবেই জানেন। বর্তমানে এই জামায়াতের আমীরের পদে আমাকে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। কাজেই একথা আমাকে পরিষ্কারভাবে বলে দিতে হচ্ছে যে, ফিকাহ ও কালামের বিষয়ে ইতিপূর্বে আমি যা কিছু লিখেছি এবং ভবিষ্যতে যা কিছু লিখব অথবা বলবো তা জামায়াতে ইসলামীর আমীরের ফায়সালা হিসেবে গণ্য হবে না বরং হবে আমার ব্যক্তিগত মত। এসব বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত রায়কে জামায়াতের অন্যান্য আলেম ও গবেষকদের উপর চাপিয়ে দিতে আমি চাই না এবং আমি এও চাই না

যে, জামায়াতের পক্ষ থেকে আমার উপর এমন সব বিধি-নিষেধ আরোপ করা হবে যার ফলে ইলমের ক্ষেত্রে, আমার গবেষণা করার এবং মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়া হবে। জামায়াতের সদস্যদেরকে (আরাকান) আমি আল্লার দোহাই দিয়ে নির্দেশ দিচ্ছি যে, ফিকাহ্ ও কালাম শাস্ত্র সম্পর্কিত আমার কথাকে আপনারা কেউ অন্যের সম্মুখে প্রমাণ স্বরূপ প্রকাশ করবেন না। অনুরূপভাবে আমার ব্যক্তিগত কার্যাবলীকেও—যেগুলোকে আমি নিজের অনুসন্ধান ও গবেষণার পর জায়েয মনে করেছি—অন্য কেউ যেন প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ না করেন এবং নিছক আমি করেছি এবং করেছি বলেই যেন বিনা অনুসন্ধানে তার অনুসারি না হন। এ ব্যাপারে প্রত্যেকের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। যারা দ্বীনের ইলম রাখেন, তারা নিজেদের গবেষণা অনুসন্ধান মুতাবিক, আর যারা ইলম রাখেন না, তারা যার ইলমের উপর আস্থা রাখেন, তার গবেষণা অনুসন্ধান মুতাবিক কাজ করে যান। উপরন্তু এ ব্যাপারে আমার বিপরীত মত পোষণ করার এবং নিজেদের মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা প্রত্যেকের রয়েছে। আমরা প্রত্যেকেই ছোটখাট এবং খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিভিন্ন মতের অধিকারী হয়ে পরস্পরের মুকাবিলায় যুক্তি প্রমাণ পেশ করে এবং বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েও একই জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারি—যেমন সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম ছিলেন।"*

দুই ঃ জামায়াতে ইসলামীতে হানাফী মাযহাব ও আহলে হাদীসের অনুসারী ব্যক্তির সমাবেশ রয়েছে। এ জামায়াতে আহলে সুন্নাত আল জামায়াতের যে কোন মাযহাবের লোক শামিল হতে পারে। জামায়াতে ইসলামী একটি জামায়াত হিসেবে কোন এক মাযহাবের ফেকাহ মানতে বাধ্য করে না। যারা জামায়াতে যোগদান করে তারা তাদের মাযহাবের অনুসরণ করে। মাওলানা মওদূদী হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু জামায়াতের মধ্যে আহলে হাদীসের লোকও রয়েছে।

তিন ঃ জামায়াতের সবারই ইসলাম সম্পর্কে অতীত ও বর্তমান সকল লেখকের বই থেকে স্বাধীনভাবে মতামত গ্রহণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। প্রাচীন ও আধুনিক তাফসীর, হাদীস ও ফেকাহ ইত্যাদি থেকে জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে প্রত্যেকেরই স্বাধীনভাবে আপন মতামত স্থির

---

* "জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী" বা রুয়েদাদ-দ্রষ্টব্য।

করার অধিকার রয়েছে। মাওলানা মওদূদী (রঃ) চিন্তার স্বাধীনতার উপর এত গুরুত্ব দিয়েছেন বলেই তাকে অন্ধভাবে অনুসরণের কোন আশংকা নেই।

চার ঃ জামায়াতে ইসলামী মাওলানা মওদূদী (রঃ)-কে ফেকাহ বা আকায়েদের ইমাম মনে করে না। তাঁর ইজতেহাদকে মেনে নেয়াও জামায়াতের কোন নীতি নয়। জামায়াতে ইসলামীর নিকট মাওলানা মওদূদী তিনটি কারণে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ঃ

(ক) এ যুগে মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পেশ করে দ্বীন ইসলামের সঠিক মর্যাদা বহাল করেছেন। ইসলাম শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ বলে সমাজে যে ভুল ধারণা ছিল তা তাঁর লেখা বিপুল সংখ্যক বই পুস্তকের মাধ্যমেই মানুষ বুঝতে শিখেছে। এ উপমহাদেশে ইসলামের এ ব্যাপক ধারণা এমন স্পষ্ট ছিল না। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর দাসত্ব ও নবীর আনুগত্য করা যে ইসলামের দাবী একথা উপমহাদেশের মানুষের নিকট তিনিই স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। কুরআন ও সুন্নাহ যে গোটা মানব জীবনের জন্য একমাত্র সঠিক ব্যাপক হেদায়াত একথা তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

(খ) দ্বীন ইসলামকে বাস্তবে মানব সমাজে কায়েম করা যে মুসলমানের প্রধান দায়িত্ব একথা মাওলানা মওদূদী (রঃ) অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে পেশ করেছেন। শুধু তা-ই নয়, এ শতাব্দীতে তিনিই ইকামাতে দ্বীনের ডাক দিয়ে এ উপমহাদেশে পয়লা বাতিলের বিরুদ্ধে জামায়াতবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ইকামাতে দ্বীনের এ ডাকে যারা সাড়া দিয়েছে এবং দিচ্ছে তারা ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব অনুভব করেই জামায়াতবদ্ধ হওয়া ফরয মনে করছে।

তিনি ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য এ জাতীয় আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন বলেই গোটা উপমহাদেশে ইসলাম আজ একটি বলিষ্ঠ বিপ্লবী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। এমনকি আধুনিক শিক্ষিত ও ছাত্র মহলে পর্যন্ত ইসলামী জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে।

(গ) মুসলিমদেরকে বিজ্ঞান সম্মত পন্থায় সুসংগঠিত করার জন্য মাওলানা মওদূদী যে সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা এ যুগে

অতুলনীয়। আধুনিক যুগে বাতিল পন্থীদের মযবুত সংগঠনের সাথে পাল্লা দিয়ে মুসলমানদেরকে একটা সুশৃংখল শক্তিতে পরিণত করার জন্য তিনি যে সাংগঠনিক কাঠামো ও কর্ম কৌশল দান করেছেন এর ফলে তারা দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া সত্ত্বেও সংগঠন কোনদিক দিয়ে দুর্বল হবার আশংকা নেই।

জামায়াতে ইসলামী মাওলানা মওদূদী (রঃ)-কে অতি মানব বা এমন কোন সত্তা মনে করে না যা অন্ধভক্তির সৃষ্টি করতে পারে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে ভক্তির বাড়াবাড়ি খতম করার জন্য সারা জীবন তিনি যে চেষ্টা করে গেছেন তার ফলে তার মধ্যে বহু দুষ্প্রাপ্য গুণের সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও মাওলানাকে জামায়াত কোন প্রকার অতি ভক্তির মর্যাদা দেয়নি।

অবশ্য মাওলানা মওদূদীকে এ যুগের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও মুজাহিদ হিসেবে এবং আধুনিক জাহিলিয়াত বা ইসলাম বিরোধী মতবাদের বলিষ্ঠতম প্রতিরোধকারী ব্যক্তিত্ব বলে দুনিয়ার চিন্তাশীল মহল অকুণ্ঠভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ সত্ত্বেও জামায়াতে ইসলামী মাওলানার ব্যক্তিত্বকে মানুষের কাছে বড় করে তুলে ধরা ইসলামী আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করেনি। মাওলানা এ বিষয়ে এত সজাগ ছিলেন যে, মাওলানার জন্ম দিবস পালন করতে তিনি অনুমতি দেননি। তার এন্তেকালের পরও উপমহাদেশের কোথাও তার জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালন করা হচ্ছে না। অথচ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকায় জামায়াতে ইসলামী প্রকাশ্য সংগঠন হিসেবেই আছে। কিন্তু কোথাও মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরা হচ্ছে না।

মাওলানা মওদূদী (রঃ) আধুনিক যুগের সমস্যা ও মানব রচিত বিভিন্ন সমাধানের বিশ্লেষণ করে কুরআন ও হাদীসের আলোকে ঐসব সমাধানের ত্রুটি স্পষ্টভাবে ধরিয়ে দিয়ে ইসলামের সমাধান যেরূপ যোগ্যতার সাথে পেশ করেছেন তাতে আমাদের মতো আধুনিক শিক্ষিত লোকের পক্ষে ইসলামকে বুঝা সহজ হয়েছে। এজন্যই মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর রচিত ইসলামী সাহিত্য ছাড়া আধুনিক যুগে ইসলামী আন্দোলন করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। তাই জামায়াতে ইসলামী তাঁর বই থেকে ফায়দা হাসিল করতে বাধ্য হচ্ছে। মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর

প্রচার যদি উদ্দেশ্য হতো তাহলে তাঁর জন্ম ও মৃত্যু দিবস অবশ্যই পালন করা হতো।

মাওলানা মওদূদী (রঃ) যাকে একমাত্র নেতা হিসেবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মেনে চলার শিক্ষা দিয়ে গেছেন সেই বিশ্ব নবীই জামায়াতে ইসলামীর আসল নেতা। মাওলানা মওদূদী যখন জামায়াতের আমীর ছিলেন তখনও তাঁর প্রতি কখনও অতিভক্তি দেখান হয়নি। তাঁর প্রকৃত মর্যাদা একমাত্র আল্লাহ পাকই দিতে পারেন। দুনিয়ায় তাঁর মর্যাদা বাড়াবার কোন দায়িত্ব জামায়াত গ্রহণ করেনি।

পাঁচ ঃ প্রায় সাত বছর আরব দুনিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশের বড় বড় ইসলামী চিন্তাবিদ ও ওলামায়ে কেরামের সাথে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। আমি তাদের সবাইকে মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর অত্যন্ত ভক্ত পেয়েছি। মাওলানা মওদূদী (রঃ)-কে এ যুগের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী চিন্তাবিদ বলেই সবাই স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। পাক-ভারত-বাংলার বাইরে কোন ইসলামী ব্যক্তিত্বই মাওলানার লেখা সম্পর্কে কোন আপত্তি তুলেননি। অথচ মাওলানার সাহিত্য আরবী ও ইংরেজী ভাষায় ব্যাপক অনুবাদ হয়েছে।

বিশ্বের বড় বড় ইসলামী চিন্তাবিদ ও মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর সাহিত্যে ইসলামের একই ধরনের ব্যাখ্যা পড়ে আমার এ ধারণাই সৃষ্টি হয়েছে যে, আমাদের দেশের যে কয়েকজন আলেম মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছেন তারা সম্ভবত মাওলানার সাহিত্যে ভালভাবে পড়েননি।

অখণ্ড ভারত বনাম পাকিস্তান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এ শতাব্দীর ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে মাওলানা মওদূদীর বলিষ্ঠ ইসলামী রাজনৈতিক চিন্তাধারা বহু বড় বড় ওলামার রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরোধী ছিল। তাদের পক্ষ থেকেই এসব ফতোয়া প্রচারিত হয়েছে। সুতরাং রাজনৈতিক কারণেই ফতোয়া দেয়া হয়েছে বলে মনে হয়। এসব ফতোয়ার কোন মযবুত দ্বীনি ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

❐

জামায়াত বিরোধী ফতোয়া

জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে যারা ফতোয়া দেন ও প্রচার করেন জামায়াত তাদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে সময় নষ্ট করে না। বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেন না, আধুনিক জাহিলিয়াতের সাথে যাদের কোন সংঘর্ষ নেই, যাদের ইকামাতে দ্বীনের কোন কর্মসূচী নেই, ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য যারা জামায়াতবদ্ধভাবে কিছু করেন না তাদের পক্ষ থেকে এ জাতীয় যেসব ফতোয়া প্রচারিত হয় তা সচেতন মুসলমানদের নিকট কোন গুরুত্বই পায় না। ফতোয়া প্রচারকগণের প্রতি যে কজনের অন্ধভক্তি রয়েছে এ ফতোয়া দ্বারা ঐসব লোককে জামায়াত থেকে ফিরিয়ে রাখাই হয়তো তাদের উদ্দেশ্য।

জামায়াত তাদের দ্বীনি খেদমতকে স্বীকার করে এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ পোষণ করে না। ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রতিপক্ষও মনে করে না। জামায়াতের প্রতিপক্ষ হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, সমাজতন্ত্রী ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। দেশে দ্বীনে হক ও দ্বীনে বাতিলের যে সংঘর্ষ চলছে তাতে অবশ্য ঐসব ফতোয়া বাতিলের পক্ষে সহায়ক হচ্ছে। বাতিলপন্থীরা ঐসব ফতোয়া তাদের পক্ষে কাজেও লাগাচ্ছে। তবুও জামায়াত ফতোয়া নিয়ে বিচলিত নয়। কারণ যারা ফতোয়া দিচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে জামায়াত কিছু করতেও চায় না, বলতেও চায় না। জামায়াত তাদেরকে বিরোধী শক্তি হিসেবে মনে করে না। তাদের সাথে জামায়াতের কোন লড়াই নেই।

এসব ফতোয়ার বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, ফতোয়াদাতাগণ মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর বই-এর কোন কোন কথা আপত্তিজনক মনে করেন এবং যেহেতু এ জামায়াতের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা সেহেতু ফতোয়াটা জামায়াতের বিরুদ্ধেও দেয়া প্রয়োজন বোধ করেন। আগেই বলেছি যে মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর প্রতিটি কথা জামায়াতের বক্তব্য হিসেবে ধরা অযৌক্তিক। যদি ফতোয়া দিতেই হয় তাহলে তা লেখকের বিরুদ্ধেই দেয়া উচিত, জামায়াতের বিরুদ্ধে নয়।

মাওলানা মওদূদীর লিখিত বই-এর সব কথার সাথে সবাই একমত হওয়া যরুরী নয়। সুতরাং ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যারা তাঁর লেখায় ভুল দেখতে পান তারা এলমি দিক দিয়ে কুরআন হাদীসের যুক্তির ভিত্তিতে সমালোচনা করলে তাদের জ্ঞান থেকে জামায়াতের লোকেরাও উপকৃত হবে। ইজতিহাদী ভুল তো সবারই হতে পারে। যোগ্য আলেমগণ সেসব ভুল ধরিয়ে দিলে দ্বীনের বড় খেদমত হবে। অবশ্য এ কাজটি বেশ কঠিন কাজ। এ কাজটি না করে যদি ফতোয়া দেয়া সহজ মনে করা হয় তাহলে ফতোয়াদাতাগণের মর্যাদা এ দ্বারা বাড়ে না। হক ও বাতিলের লড়াই যেখানে চলছে সেখানে এ ফতোয়া বাতিলেরই সহায়ক হয়।

ফতোয়াদাতাগণ যদি ইকামাতে দ্বীনের মহান দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামীর চেয়ে উন্নত কোন দ্বীনি জামায়াত কায়েম করেন এবং আমাদের মতো কর্মীরা যদি অনুভব করে যে, আমরা ইসলামকে কায়েম করার যে নিয়তে জামায়াতে যোগদান করেছি সে উদ্দেশ্য তাদের কায়েম করা জামায়াতে গেলে আরও ভালভাবে সফল হবে, তাহলে এ জামায়াত ত্যাগ করে তাঁদের জামায়াতে যেতে একটুও দ্বিধা করবো না। কিন্তু ইকামাতে দ্বীনের কোন প্রোগ্রাম যাদের নেই তারা যখন জামায়াতের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেন, তখন তাঁদের সচেতন মু'তাকিদ, অনুসারী ও সাগরিদদের নিকটও তাঁদের মর্যাদা নষ্ট হয়।

এসব ফতোয়া দেয়া যে ইসলামের কোন সত্যিকার খেদমত নয়, বরং এ দ্বারা যে ইসলামী আন্দোলনে বিরোধীদের তালিকায় তাঁদের নাম শামিল হচ্ছে সে কথা বুঝবার তৌফিক আল্লাহ পাক তাদেরকে দিন এ দোয়া করা ছাড়া তাঁদের মতো খাদেমে দ্বীনদের সম্পর্কে আর কিছু বলার নেই। আদালতে আখেরাতেই চূড়ান্তভাবে দেখা যাবে যে, হকের পক্ষে কারা কাজ করছে, আর বাতিলের সহায়ক কারা ছিল।

জামায়াতে ইসলামী ইকামাতে দ্বীনের যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তা সঠিকভাবে বিবেচনা করে দেখার জন্য ফতোয়াদাতাগণের নিকট আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ পাক তাদেরকে যেটুকু যোগ্যতা দিয়েছেন তা নেতিবাচক কাজে খরচ না করে ইসলামের পক্ষে ইতিবাচক কাজে ব্যয়

করার জন্য অনুরোধ করছি। আর যদি জামায়াতে ইসলামীকে সংশোধন করার নিয়তে যে কোন ধরনের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেন তাহলে জামায়াত তাদের এ মহান খেদমতের জন্য শুকরিয়া জানাবে। যারা দরদী মন নিয়ে এ জাতীয় সংশোধনের চেষ্টা করেন তারা ফতোয়ার ভাষায় কথা বলেন না।

❐

মাওলানা মওদূদী (রঃ) বিরোধী ফতোয়া

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) কুরআন পাকের তাফসীর ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবনী সহ ইসলাম সম্পর্কে ছোট বড় শতাধিক বই লিখেছেন। তার অগণিত পাঠক-পাঠিকা দেশে বিদেশে ছড়িয়ে আছে। যিনি এত কিছু লিখেছেন তার লেখায় কোন ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। যারা জ্ঞান চর্চায় নিযুক্ত তারা যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে তার লেখার সমালোচনা করলে দ্বীনের অবশ্যই উপকার ও খেদমত হবে। এ বিষয়ে উপমহাদেশের কয়েকজনের লেখা পড়ে আমিও অনেক উপকৃত হয়েছি।

কিন্তু কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তার বিভিন্ন লেখা থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে এমন বিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন যে, কোন নিরপেক্ষ পাঠক মূল বই ও সমালোচকদের লেখা পড়লে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, লেখকের মূল বক্তব্যের সাথে সমালোচনার কোন মিল নেই। কতক সমালোচকের ভাষা থেকে তাদের বিদ্বেষই প্রকাশ পায়।

যারা অন্ধবিরোধী ও বিদ্বেষী তারা সংশোধনের উপযোগী ভাষা ব্যবহার না করে ফতোয়ার হাতিয়ার ব্যবহার করেন—এমনকি কারো কারো বক্তব্য হীন গালি-গালাজের পর্যায়েও পড়ে। যারা সত্য তালাশ করেন তারা যদি মূল বই পড়ার চেষ্টা করেন তাহলেই শুধু সুবিচার করতে পারবেন। মূল বই যারা পড়েননি তারা কোন সমালোচকের লেখা পড়েই যদি সিদ্ধান্ত নেন তাহলে অবশ্যই লেখকের প্রতি অবিচার করা হবে। আসামীর জবানবন্দি না নিয়ে শুধু ফরিয়াদির নালিশ শুনেই যে বিচারক রায় দিয়ে বসে তাকে কখনও ন্যায় বিচারক বলা চলে না।

মাওলানা মওদূদী লিখেছেন বলেই কোন কথা সঠিক বলে আমি গ্রহণ করি না। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলীল সহকারে যেসব কথা তিনি পেশ করেছেন তা আমার বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা যাচাই করেই গ্রহণ করি। তাই যারা দলীল ও যুক্তির ভিত্তিতে তাঁর সমালোচনা করেন তাদের কথাও গ্রহণ করতে আমি দ্বিধা করি না। কারণ মাওলানা মওদূদী (রঃ)-কে আমি নির্ভুল মনে করি না। কিন্তু যারা ফতোয়ার ভাষায় কথা বলেন, তারা মাওলানার ভুল সংশোধনের চেয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করাই তাদের উদ্দেশ্য বলে তাদের কথা আমি বিবেচনা যোগ্যই মনে করি না।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, "খেলাফত ও মুলুকিয়াত" বইতে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে যেসব কথা আলোচনা হয়েছে তাকে ভিত্তি করে কোন কোন সমালোচক মাওলানা মওদূদী (রঃ)-কে সাহাবায়ে কেরামের নিন্দাকারী ও অপমানকারী বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। তাদের লেখার বিদ্বেষপূর্ণ ভাষা থেকে মনে হয় যে, মাওলানা মওদূদী (রঃ) যেন সাহাবাদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই বইটি লিখেছেন অথচ তাফহীমুল কুরআন নামক মাওলানার তাফসীর ও অন্যান্য অনেক বইতে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে সুন্নাত আল জামায়াতের আকীদা মোতাবেক যেসব উচ্ছসিত ও আবেগপূর্ণ প্রশংসা করা হয়েছে সেসব কথা তারা পড়েছেন কিনা জানি না। "খেলাফত ও মুলুকিয়াত" বইতে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করা হয়েছে তার সবটুকু কথা আমিও সমর্থন করি না এবং সবটুকু কথা গ্রহণও করিনি। কিন্তু তাই বলে মাওলানা মওদূদী (রঃ)-কে সাহাবী বিদ্বেষী বলে প্রচার করা মওদূদী বিদ্বেষেরই পরিচায়ক।

"খেলাফত ও মুলুকিয়াত" বইটিতে যে বিষয় আলোচনা করা হয়েছে তা ইসলামের ইতিহাসের এমন দুঃখজনক কতক ঘটনার সাথে জড়িত যে, যারাই এ বিষয়ে কলম ধরবে তাদের পক্ষে একই সাথে হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-কে সঠিক নীতির উপর কায়েম ছিলেন বলে প্রমাণ করা অসম্ভব। আহলে সুন্নাত আল জামায়াতের আকীদা অনুযায়ী হযরত আলী (রাঃ) খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকে মেনে নেননি। এ অবস্থায় উভয়ই কি করে একই মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন ?

হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও আহলে সুন্নাত আল জামায়াত তাঁকে খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। তাঁকে খলীফা না বলে আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) বলা হয়। এর নিশ্চয়ই কোন কারণ রয়েছে। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) ইসলামের বিরাট খেদমত করেছেন বলে স্বীকার করেও ইসলামী খেলাফতের নীতি ও আদর্শের দিক দিয়ে ঐতিহাসিকগণ তাঁর নীতিকে সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন। যারাই হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষে যুক্তি দেয়ার চেষ্টা করেছেন তারা খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী (রাঃ)-কে দোষী সাব্যস্ত করতে বাধ্য হয়েছেন। সুতরাং এ ইতিহাস এমন সমস্যাপূর্ণ যে, এ দু'জনকে একই মর্যাদার অধিকারী মনে করা এক প্রকার অসম্ভব।

তাই ইতিহাসের অনিবার্য প্রয়োজনে যারা এ বিষয়ে আলোচনা করেন তাদের কথা নিয়ে সর্ব সাধারণের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় চর্চা করা উচিত নয়। যারা ঐতিহাসিক নয় তারা এ নিয়ে বিতর্ক করতে গেলে ফেতনা সৃষ্টি হবারই আশংকা রয়েছে।

ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি আলোচনা করতে গিয়ে মাওলানা মওদূদী (রঃ) কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা-কে আইনের উৎস বলে উল্লেখ করেছেন। ইজমা মানে সর্বসম্মত রায়। উম্মাতে মুহাম্মাদীর ওলামায়ে কেরাম কোন বিষয়ে একমত হলে সেটাকেই যিনি শরীয়াতের হুজ্জাত বা দলীল বলে স্বীকার করেন তিনি যে সাহাবায়ে কেরামের ইজমাকে আরও উচ্চমানের হুজ্জাত মনে করেন তাতে সন্দেহ করার কোন যুক্তি নেই।

১৯৫০ সালে আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নাদভী (রঃ)-এর সভাপতিত্বে করাচীতে অনুষ্ঠিত সর্ব শ্রেণীর ৩১জন বড় বড় আলেমের যে সম্মেলনে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি ঘোষণা করা হয় সেখানে মাওলানা মওদূদী (রঃ) যোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তদানীন্তন পাকিস্তানের ৩১জন শ্রেষ্ঠ ওলামার মধ্যে মাওলানা মওদূদী (রঃ) বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এমন একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যারা ফতোয়া দেন তারা নিজেদের মর্যাদাই নষ্ট করেন। যুক্তির মাধ্যমে মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর বক্তব্য খণ্ডন করা অবশ্যই দ্বীনি দায়িত্ব। কিন্তু ফতোয়া প্রচার করা দ্বারা দ্বীনের কোন উপকার হচ্ছে কিনা তা বিবেচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করছি।

আরও একটা কথা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসংগিক হবে না বলে মনে হয়। মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর বিরুদ্ধে পাক-ভারত ও বাংলাদেশের কয়েকজন আলেম অবশ্যই বিরূপ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু দুনিয়ার বড় বড় ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মওদূদী (রঃ)-কে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ও ইসলামের মহান বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকার করেন। তাঁর লেখা তাফসীর ও অন্যান্য বই দুনিয়ার ৪০টি ভাষায় তরজমা হয়ে লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট ইসলামের আলো পৌঁছাচ্ছে। সুতরাং এ দেশের কিছু সংখ্যক লোক ফতোয়া দিয়ে এ আলোকে চাপা দিয়ে রাখতে পারবেন না। আমার বিশ্বাস যে তারা যদি মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর বইপত্র মন দিয়ে পড়তেন তাহলে পছন্দই করতেন।

ওলামা ও মাশায়েখে কেরামের খেদমতে

ওলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখে এযামের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা ও মহব্বত পোষণ করি। কারণ তাঁরাই হলেন নবীর ওয়ারিস। তাঁদের কাছেই কুরআন ও সুন্নার ইলম পাওয়া যায়। অশিক্ষিত লোকদের তো তাঁদের খেদমতে যাওয়া ছাড়া দ্বীনি ইলম ও আমল শেখার কোন পথই নেই। আধুনিক শিক্ষিতদেরও ইসলামের সঠিক জ্ঞান পেতে হলে এবং রাসূলের অনুসরণ করতে হলে ওলামা ও মাশায়েখের সাহায্য নেয়া ছাড়া উপায় নেই। দ্বীনের ব্যাপক জ্ঞান কুরআন ও হাদীস থেকেই পেতে হয় এবং এ বিষয়ে যারা জ্ঞানী তাঁদের সহায়তা ছাড়া যে ইংরেজী শিক্ষিত এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারীদের কোন উপায় নেই এর সাক্ষী আমি নিজে।

কুরআন, হাদীস ও ফেকাহ থেকে গভীর ইলম হাসিল করার জন্য কোন কাওমী বা আলীয়া মাদ্রাসায় পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। যেটুকু সামান্য জ্ঞান আল্লাহ্ পাক আমাকে দান করেছেন তা হাক্কানী ওলামা ও মাশায়েখের মারফতেই পেয়েছি। আলেম পিতার বিশেষ তাগিদে বি. এ. পর্যন্ত অন্যতম বিষয় হিসেবে আরবী পড়তে বাধ্য হওয়ায় যেটুকু আরবী ভাষা আয়ত্ব হয়েছিল সেটুকু সম্বল করেই ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনার কিছু চেষ্টা করেছি। স্কুল জীবন থেকেই বাংলা ভাষায় হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ)-এর অনুদিত বই পড়ার সুযোগ হয়। ১৯৩৮ সালে আমি যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র তখন থেকেই "নেয়ামত" নামক মাসিক পত্রিকার নিয়মিত পাঠক হিসেবে হযরত থানভী (রঃ)-এর যুক্তিপূর্ণ ওয়ায দ্বারা আমি গভীরভাবে আকৃষ্ট হই। তাই হযরত থানভী (রঃ)-এর লেখার অনুবাদক হিসেবেই হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রঃ)-এর সাথে আমার ঘনিষ্ট সম্পর্ক হয়।

১৯৫০ সালে এম. এ. পরীক্ষার কয়েক মাস আগে তাবলীগ জামায়াতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পরীক্ষার পর তিন চিল্লায় বের হই। এ দেশে তাবলীগ জামায়াতের আমীর হযরত মাওলানা আবদুল আযীযের সাথে চিল্লা দেবার সুযোগ পাওয়ায় এবং তাবলীগের চিল্লা উপলক্ষে হিন্দুস্তান গিয়ে অনেক যোগ্য আলেমের সোহবতে দ্বীনের পথে জীবন

উৎসর্গ করার প্রেরণা পাই। সাড়ে চার বছর তাবলীগ জামায়াতে নিয়মিত কাজ করার যে তৌফিক আল্লাহ্ পাক দিয়েছেন তাতে আমার জীবনে এ জযবা পয়দা হয়েছে যে, দ্বীন ইসলামই মুসলিম জীবনের একমাত্র মিশন বা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

১৯৫২ সালে তমদ্দুন মজলিসের সাথে সম্পর্ক হওয়ার ফলে ইসলামকে একটি বিপ্লবী আন্দোলন হিসেবে বুঝবার সুযোগ হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবন যে শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক জীবনেও রাসূল যে বিপ্লব সাধন করেছেন সেদিক থেকেও ইসলাম সম্পর্কে তখন পড়াশুনা শুরু করি। তমদ্দুন মজলিসের মারফতেই সর্বপ্রথমে আমি মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর কিছু বই বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় পড়ার সুযোগ পাই।

এরপর দু' বছর পর্যন্ত আমি একাগ্রচিত্তে তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিসে কাজ করতে থাকি। একই সাথে এ দুটো সংগঠনের সাথে কাজ করে দু' দিকের বই পুস্তক ভালভাবে পড়ার সুযোগ পাই। আমি তখন অনুভব করি যে, ইসলামের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক দিকের জন্য তাবলীগ জামায়াতে থাকা আমার জন্য অপরিহার্য এবং ইসলামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দিকের জন্য তমদ্দুন মজলিস ত্যাগ করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামকে মনে প্রাণে গ্রহণ করার পর শুধু তাবলীগ জামায়াত বা তমদ্দুন মজলিসে আমার তৃষিত মনের খোরাক পেতাম না। তাই এ দুটোর সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম পাওয়ার চেষ্টা করছিলাম।

সেকালে লালবাগ শাহী মসজিদে তাবলীগ জামায়াতের মাসিক বড় ইজতিমা হতো। তাতে আমাকেও বক্তৃতা দিতে হতো। তাবলীগের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ছয় উসুলের যে বক্তৃতা আমি করতাম তা শুনে হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রঃ) তাঁর নিকটবর্তী লোকদের কাছে আমার সম্পর্কে মন্তব্য করতেন, "এ লোক তাবলীগ জামায়াতের কর্মসূচী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না।" পরবর্তীকালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করার পর তাঁর সাথে দেখা করতে গেলে সেখানে উপস্থিত অনেককে সাক্ষী রেখে বললেন, "আমি বলেছিলাম না যে, তাবলীগ জামায়াত একে আটকিয়ে রাখতে পারবে না?"

তাঁর একথা শুনে আমি অনুভব করলাম যে, তাবলীগ জামায়াতের মঞ্চে বক্তৃতাকালেও তমদ্দুন মজলিসের ইসলামী বিপ্লবের সুর আমার কথায় হয়ত প্রকাশ পেতো। তাই তাঁর মতো জ্ঞানী ব্যক্তি একথা আঁচ করতে পেরেছিলেন। জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করার কারণে তিনি আমাকে উৎসাহিত করায় আমি আরও নিশ্চিন্ত হলাম।

১৯৬৮ সালে ইংরেজী ভাষায় আমার লেখা A Guide to Islamic Movement. (ইসলামী আন্দোলনের দিশারী) নামক বই-এর ভূমিকায় আমি লিখেছিলাম, "আমার পিতা থেকে ইসলামকে একটি ধর্ম বলেই বুঝেছিলাম। হযরত মাওলানা থানভী (রঃ)-এর লেখা ও মাওলানা ফরিদপুরী (রঃ)-এর সোহবতে বুঝতে পারলাম যে, ইসলাম অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ধর্ম। তাবলীগ জামায়াতের মাধ্যমে অনুভব করলাম যে, ইসলাম এক মহান মিশন এবং এর জন্য জীবন উৎসর্গ করাই ঈমানের দাবী। জামায়াতে ইসলামীতে এসে অনুধাবন করলাম যে, ইসলাম এমন এক বিপ্লবী আন্দোলন যার মাধ্যমে আল্লার যমীনে আল্লার বিধানকে কায়েম করার জন্য চেষ্টা করা মু'মিনের জীবনের সবচেয়ে বড় ফরয। এখন আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি যে, হযরত থানভী, তাবলীগ জামায়াত, তমদ্দুন মজলিস ও জামায়াতে ইসলামী আমাকে ক্রমিক পর্যায়ে সত্যিকার মুসলিম হবার প্রেরণা দিয়েছে। জামায়াতে ইসলামীতে এসে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের রূপ বিস্তারিতভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছি।

জামায়াতে ইসলামীর বাইরে এমন কয়েকজন বড় আলেমের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল যাদের কাছ থেকে দ্বীনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমি যথেষ্ট আলো পেয়েছি। তাঁরা যেহেতু আমাকে স্নেহ করতেন সেহেতু অল্প সময়েও অনেক বেশী ফায়দা তাদের কাছ থেকে হাসিল করার সুযোগ তাঁরা দিতেন। হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রঃ)-এর মাধ্যমেই হযরত মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আজমী (রঃ)-এর মতো মহাজ্ঞানীর সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সকল প্রকার দ্বীনি খেদমত ও সব দ্বীনি সংগঠনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং সবার সম্পর্কে উদার মনোভাব পোষণ করার ব্যাপারে এ দু'জনের মতো এমন বিশালমনা লোক বাংলাদেশে আমি পাইনি। এ দু'জনের সাথে যত বেশী সময় ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ পেয়েছি অন্যদের সাথে এতটা না পেলেও

অনেকের সংস্পর্শে বহু মূল্যবান শিক্ষা পেয়েছি। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন ঃ

হযরত মাওলানা সাইয়েদ মাহমুদ মুস্তফা আল মাদানী শহীদ (রঃ)
হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আকরাম খান (রঃ)
হযরত মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী (রঃ)
হযরত মাওলানা আতহার আলী (রঃ)
হযরত মাওলানা মুফতী দ্বীন মুহাম্মাদ খান (রঃ)
হযরত মাওলানা মুফতী সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (রঃ)

জামায়াতে ইসলামীর অন্তর্ভুক্ত পাকিস্তান, হিন্দুস্তান ও বাংলাদেশের বহু ওলামার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁদের এবং জামায়াতের বাইরের অনেক ইসলামী চিন্তাবিদের বই-পুস্তককে আমার দ্বীনি যিন্দেগীর পাথেয় হিসেবে পেয়েছি।

এ আলোচনা দ্বারা একথাই প্রকাশ করতে চাই যে, আমাদের মতো অগণিত আধুনিক শিক্ষিত লোকের পক্ষে ইসলামের ইলম ও আমল সম্বন্ধে শিক্ষা পেতে হলে ওলামা ও মাশায়েখের সাহায্য ছাড়া উপায় নেই। আল্লার ফযলে আজ স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে মাওলানা মওদূদী (রঃ) ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের বই-পুস্তকের মাধ্যমে ছাত্র সমাজ পর্যন্ত ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। যে শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা ইসলামী ইলম ও আমলের বিপরীত মন-মগয চরিত্রের লোক তৈরী হচ্ছে সেখানে যেসব ইসলামী সাহিত্য এমন উৎসাহজনক জাগরণ সৃষ্টি করেছে সেসব সাহিত্য ওলামাদেরই রচিত।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, ইসলামী আন্দোলনের ছাত্র ও অছাত্র কর্মীরা ইসলামী জীবন বিধানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এবং কুরআন পাককে রাসূলের ইসলামী আন্দোলনের আলোকে বুঝবার জন্য যেসব বই-পুস্তকের সাহায্য নিচ্ছে এর বেশীর ভাগই মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর লেখা। কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে রচিত অতীত ও বর্তমানের অন্য ওলামাদের যেসব বই বাংলায় পাওয়া যায় তা থেকেও তারা যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করছে। কিন্তু মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর এ লেখা বাদ দিয়ে চলার কোন উপায় নেই বলে বাধ্য হয়ে তাঁর লেখা বই সবাই পড়ছে।

যদি আর কারো ইসলামী সাহিত্য প্রচুর থাকত এবং তাদের সাহিত্য যদি ইসলাম বিরোধী মত ও পথের বিরুদ্ধে মযবুত কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারতো তাহলে আমাদের মতো আধুনিক শিক্ষিত অনেকেই মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর সাহিত্য ছাড়াই এ পথে এগুতে পারতো।

ওলামা ও মাশায়েখে কেরাম কি এমন আর কোন ব্যক্তির নাম পেশ করতে পারেন যার সাহিত্য আমাদেরকে ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে এ যুগের উপযোগী ভাষায় বিস্তারিত শিক্ষা দিতে পারে ? এ পরিস্থিতিতে যখন কোন আলেম মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর বিরুদ্ধে ফতোয়া দেন তখন তাঁর সম্পর্কে ইসলামী আন্দোলনের শিক্ষিত কর্মীদের কিরূপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে ? কোন দ্বীনি ব্যক্তি যখন বলেন যে, "আমি মওদূদীর ইসলাম পছন্দ করি না" তখন কর্মীদের মনে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে যে, মওদূদী (রঃ) ইসলামকে যতটুকু বুঝাবার চেষ্টা করেছেন তা তো তার লেখা সাহিত্যে স্পষ্টই দেখা যায়। কিন্তু যিনি ঐ কথা বলেন তিনি ইসলামের কোন ভাল ব্যাখ্যা দিয়েছেন কিনা সে কথা তো কারো জানবারই সুযোগ হলো না। তাহলে ঐ ব্যক্তির এ জাতীয় ঘোষণা দ্বারা ময়দানের হাযার হাযার কর্মীর মনে কি তাঁর সম্পর্কে কোন সুধারণার সৃষ্টি হতে পারে ? যদি তিনি সঠিক ইসলাম পেশ করে নিজেকে "মওদূদীর ভুল ইসলাম" থেকে রক্ষা করার যোগ্য বলে প্রমাণ দিতে পারতেন তাহলে ইসলামের জন্য যারা বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে তাঁরা তাকেই নেতা হিসেবে গ্রহণ করতো এবং মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর বই পড়ার দরকার মনে করতো না।

আমি সকল হাক্কানী ওলামা ও মাশায়েখের খেদমতে অতি বিনয়ের সাথে আরয করছি যে, আপনারা মেহেরবানী করে একটু সময় ও শ্রম খরচ করে মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর ৬ খণ্ডে লিখিত তাফসীর "তাফহীমুল কুরআন" এবং এ যুগের মানুষের অগনিত প্রশ্নের ৭ খণ্ড জওয়াব "রাসায়েল ও মাসায়েল" নামক পুস্তকগুলো পড়ে দেখুন। শুধু অন্যের মন্তব্য শুনেই সিদ্ধান্ত না নিয়ে নিজে দেখে ফায়সালা করুন। এটা বিরাট যিম্মাদারীর কাজ। আল্লার কাছে আমাদের সবারই জবাবদিহি করতে হবে।

আজ বাংলাদেশে ইসলামের বিরুদ্ধে কত বড় বড় ফিতনা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ! ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র

ইত্যাদি বিরাট শক্তি নিয়ে এ দেশ থেকে ইসলামী আদর্শকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বাস্তবে ময়দানে এসব ফিতনার মুকাবিলায় কারা কতটুকু ইসলামের পক্ষে কাজ করছেন তা দেশবাসী সবাই দেখতে পাচ্ছে। ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো কাদেরকে প্রকৃত দুশমন মনে করছে তাও সবাই দেখছেন। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়সহ ময়দানে যারা ইসলামী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করছে এবং যাদের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও সমাজতন্ত্রীরা এক জোট হয়ে লেগেছে তারা কি আপনাদের সবার সাহায্য-সহানুভূতি ও সমর্থনের কোন হক রাখে না ?

এ অবস্থায় ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন না করে যারা ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে 'মওদূদী ফিতনা' বলে ফতোয়া দেন তাদের এ কাজ কি পরোক্ষভাবে ইসলামের দুশমনদের পক্ষে যায় না ? ইসলামের প্রতি সত্যিকার দরদ থাকলে ময়দানে কর্মরত ইসলামী কর্মীদেরকে সাহায্য করাই স্বাভাবিক। মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর বই-এর যেসব কথা কুরআন ও হাদীস সম্মত নয় বলে কেউ মনে করেন যুক্তি সহকারে সেসব ভুল ধরিয়ে দিন। এভাবে ভুল ধরিয়ে দিলে ইসলামের বিরাট খেদমত হবে এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা এ ধরনের ওলামা ও মাশায়েখের নিকট কৃতজ্ঞ থাকবে। কিন্তু এ কষ্টটুকু স্বীকার না করে যদি ফতোয়া দিয়েই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করা হয় তাহলে ফতোয়াদাতাগণ সচেতন লোকদের কাছে শ্রদ্ধার আসন কি করে পাবেন ?

ওলামা ও মাশায়েখ সাহেবানের খেদমতে একটা বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা ও বিবেচনা করার জন্য আমি আকুল আবেদন জানাচ্ছি। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, ভারতপন্থী ও সমাজতন্ত্রী দলগুলো কিভাবে বৈদেশিক পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে তা নিশ্চয়ই আপনারা লক্ষ্য করছেন। ছাত্র সমাজের মধ্যেও এসব দলের বহু সংগঠন আছে। এসব ইসলাম বিরোধী শক্তির মুকাবিলায় বৃহত্তর ময়দানে জামায়াতে ইসলামী এবং ছাত্র মহলে ইসলামী ছাত্র শিবির যে সংগ্রাম করে যাচ্ছে তাও আপনাদের অজানা নয়। এ অবস্থায় যারা ইসলামকে ভালবাসেন তাদের কী কর্তব্য হওয়া উচিত তা আপনারাই বিবেচনা করুন। এ পরিস্থিতিতে জামায়াতে ইসলামীকে সাহায্য সহযোগিতা দান করাই কি দ্বীনি দায়িত্ব নয় ? এ

দায়িত্ব পালন না করার ফলে যদি ইসলাম বিরোধী শক্তি বিজয়ী হয়ে যায় তাহলে আপনাদের বর্তমান দ্বীনি খেদমতটুকুর সুযোগ থাকবে কিনা তা চিন্তা করার এখনও সময় আছে।

সর্বশেষে আরয করতে চাই যে, মাওলানা মওদূদীর লেখা বই-এর মধ্যে আহলি সুন্নাত আল জামায়াতের খেলাফ যদি কোন কথা থাকে তাহলে সেসব চিহ্নিত করার ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করুন। আমরা নিজেদেরকে আহলি সুন্নাত আল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত বলে বিশ্বাস করি। তাই এদিক দিয়ে তার বই-এর মধ্যে ভুল থাকলে তা আমরা কোনক্রমেই গ্রহণ করবো না। এ বিষয়েও একটি কথার দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কেউ কেউ মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর কোন কথা মূল বই-এর বক্তব্য থেকে আলাদা করে (সিয়াক ও সাবাক ছাড়া) এমনভাবে পেশ করে থাকেন যার ফলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। তাই মূল বই না দেখে শুধু বিচ্ছিন্ন কোন কথার ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা নিরাপদ নয়।

অগণিত আধুনিক শিক্ষিত লোকের সাথে আমার ব্যাপক যোগাযোগ হয়। তাদের অধিকাংশই আলেম সমাজ সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখে না। তাদের সাথে আমার বিতর্ক হয় তাদেরকে আমি বুঝাই যে দ্বীনের ইলম আলেম সমাজ থেকেই পেতে হবে। তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে দ্বীনের ইলম কোথায় পাওয়া যাবে ? আলেম সমাজকে আধুনিক শিক্ষিত লোকদের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে গণ্য হতে হলে ফতোয়ার ভাষায় মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর সমালোচনা না করে সংশোধনের নিয়তে ভুল ধরিয়ে দিতে হবে। যেসব শিক্ষিত লোক ইসলাম সম্পর্কে জানতে উৎসাহী তারা মাওলানা মওদূদীর বইকেই প্রধান সম্বল হিসেবে পান। ফতোয়ার কারণে যদি এসব লোকের মনে ওলামা ও মাশায়েখ সম্পর্কে অশ্রদ্ধার সৃষ্টি হয় তাহলে দ্বীনের বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। কিন্তু দরদপূর্ণ ভাষায় যদি তারা ভুল ধরিয়ে দেন তাহলে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যাবে।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-